সেপ্টেম্বর ২০১৯ ▪ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

শেখ হাসিনার জন্মদিন
প্রদীপ্ত আলোর এক অভিযাত্রী

পর্যটন খাতে সরকারের সাফল্য

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯

বাহাদুর শাহ্ পার্ক
সিপাহী বিপ্লবের নীরব সাক্ষী

আমাদের ছোট নদী ও
রবীন্দ্রনাথের পদ্মাপ্রীতি

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

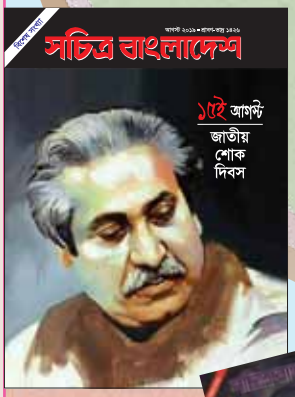

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

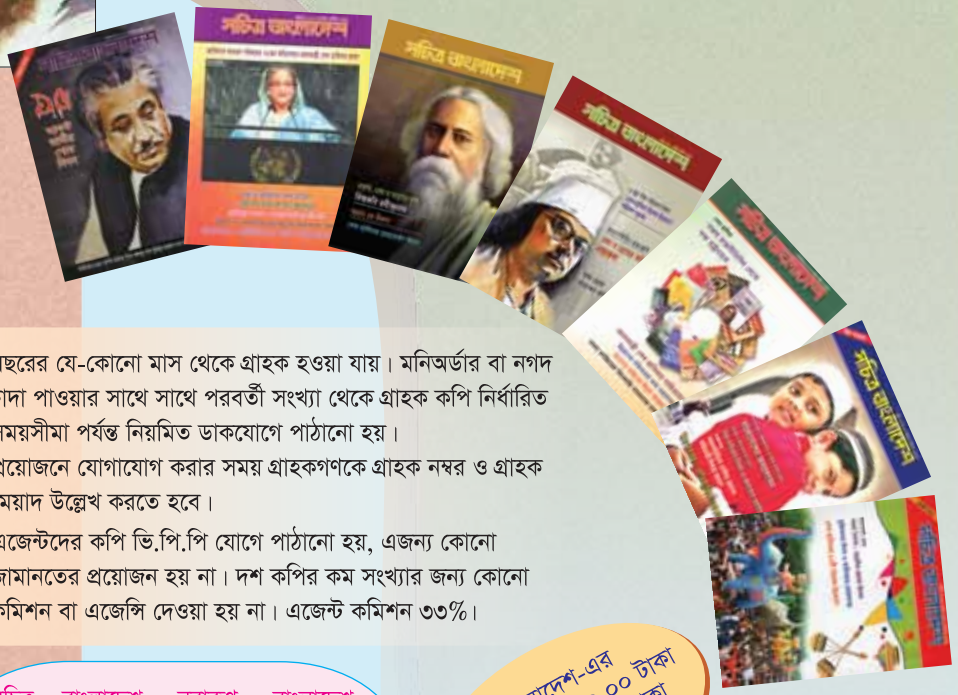

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 40, No. 03, September 2019, Tk. 25.00

ঝুলন্ত ব্রিজ, রাঙ্গামাটি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর ২০১৯ ▫ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৬

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার তুলে দেন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)-এর বোর্ড সভাপতি Dr. Ngozi Okonjo-Iweala–পিআইডি

সম্পাদকীয়

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলকে সুসংগঠিত করেন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে প্রথম, ২০০৮ সালে দ্বিতীয়, ২০১৪ সালে তৃতীয় এবং ২০১৮ সালে চতুর্থবারের মতো নির্বাচনে জয়লাভ করে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। দেশ ও জাতির উন্নয়নে তাঁর অব্যাহত আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ধারাবাহিক সাফল্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বহুল প্রশংসিত। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সফল রাষ্ট্রনায়ক, সুলেখক, সংস্কৃতিমনা ও উন্নয়ন-অগ্রগতির আলোকবর্তিকা। তাঁর ৭৩তম জন্মদিনে *সচিত্র বাংলাদেশ* পরিবারের পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। এ উপলক্ষে রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সাক্ষরতা। সাক্ষরতাই টেকসই সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠি। এক্ষেত্রে দেশে বৈপ্লবিক অগ্রগতি হয়েছে। এ দিবস নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যটন দিবস। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। অবকাঠামো উন্নয়ন ও পর্যটন খাতের বিকাশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যটন খাতকে আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। উল্লেখ্য, অপার সম্ভাবনাময় পর্যটন খাতের দ্বার খুলে যায় ১৯৭২ সালে পর্যটন শিল্প করপোরেশন গঠনের মধ্য দিয়ে। এ মহৎ কাজটি করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ বিষয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম মহাবিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের নীরব সাক্ষী বাহাদুর শাহ্ পার্ক। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতর নক্ষত্র। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রয়েছে তাঁদের অপরিমেয় অবদান। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের গান ও কবিতা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ।

মহররম, দুর্গাপূজা ও শরৎ ঋতু নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ। আরো আছে কবিতা ও গল্পসহ নিয়মিত অন্যান্য প্রতিবেদন।

আশা করি, এ সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন
সিনিয়র সম্পাদক
মো. জাহিদুল ইসলাম
সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান
সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা
আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩২১২৯, ৯৩৩৩১৪৯
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ

শেখ হাসিনার জন্মদিন: প্রদীপ্ত আলোর এক অভিযাত্রী ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

শেখ হাসিনার প্রবাস জীবন ৭
শামস সাইদ

মাদার অব হিউম্যানিটির নজর সর্বদিকে ১০
আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

বাহাদুর শাহ্ পার্ক: সিপাহী বিপ্লবের নীরব সাক্ষী ১১
মো. আলী হোসেন

আমাদের ছোট নদী ও রবীন্দ্রনাথের পদ্মাপ্রীতি ১২
ফারিহা রেজা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি ১৫
সাহিদা বেগম

পর্যটনে অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ ১৮
হোসেন জাহিদ

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ ২০
মিতা খান

ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি ২২
মিয়াজান কবীর

উচ্চ মাত্রায় এফডিআই আহরণ এখন সময়ের দাবি ২৫
এম এ খালেক

প্রথম মুসলিম সবাক চিত্র নায়িকা রাণী যোবায়দা ২৭
অনুপম হায়াৎ

জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় ১৫ প্রস্তাবে ইউএন-এর সম্মতি প্রসঙ্গে ২৮
মোতাহার হোসেন

হায়! হোসেন ২৯
সাদিয়া সুলতানা

বিশ্ব ওজোন দিবস ৩০
আনিকা তাবাসসুম

জাতীয় বিষয়াবলি দেশের অহংকার ৩১
সাব্বির আহমদ

শারদীয় দুর্গোৎসব ৩৩
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

নৌপরিবহণ খাতে সরকারের সাফল্য ৩৪
জান্নাত হোসেন

শরৎ ও কাশফুল: একে অপরের ৩৫
মো. শাহাজাহান হোসেন

প্রান্তজনের স্বাস্থ্য সেবায় অনন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ৩৬
মো. শামীম সিকদার

হাইলাইটস

ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বে গণতন্ত্র ৩৭
আহনাফ হোসেন

চলচ্চিত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ৩৮
আপন চৌধুরী

অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার ১৪২৪ ৩৮
মারুফ রহমান

গল্প

বাবুরেও লইয়া যাইবেন ৪১
দিরাজুর রহমান খান

জীবনের আলোছায়া ৪৪
রুনা তাসমিনা

কবিতাগুচ্ছ ১৩, ২৪, ৩৩, ৩৯, ৪০
রুহুল গনি জ্যোতি, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, হাসান হাফিজ শাফিকুর রাহী, শান্তনু চট্টোপাধ্যায়, মঈনুল হক চৌধুরী সৈয়দ শাহ্‌রিয়ার, বাবুল তালুকদার, রুস্তম আলী মাইন উদ্দিন আহমেদ, ইফফাত রেজা, ইমরুল ইউসুফ শাহ্‌নাজ, আনসার আনন্দ, মো. ফয়সাল আতিক

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৬
প্রধানমন্ত্রী ৪৭
তথ্যমন্ত্রী ৪৭
জাতীয় ঘটনা ৪৯
আন্তর্জাতিক ৫০
উন্নয়ন ৫০
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫১
শিল্প-বাণিজ্য ৫২
শিক্ষা ৫৩
বিনিয়োগ ৫৩
নারী ৫৪
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৫
কৃষি ৫৫
বিদ্যুৎ ৫৬
কর্মসংস্থান ৫৭
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
নিরাপদ সড়ক ৫৮
যোগাযোগ ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৯
মাদক প্রতিরোধ ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
প্রতিবন্ধী ৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬০
চলচ্চিত্র ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬২
ক্রীড়া ৬৩
শ্রদ্ধাঞ্জলি: না ফেরার দেশে চলচ্চিত্র অভিনেতা বাবর ৬৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন

গোপালগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণে পাটগাতী ইউনিয়নের ঘাঘর ও মধুমতী নদীবিধৌত এলাকার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পড়াশোনা করেন ঢাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি কৈশোর থেকেই রাজনীতি সচেতন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার মতো দেশকে ভালোবাসেন। আর দেশের মানুষও তাঁকে ভালোবাসেন। এদেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে তিনি পাশে দাঁড়ান সাহায্যের ডালি নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নয়, একজন মমতাময়ী মায়ের মতো তাঁর সকল কর্মকাণ্ড। তাঁর স্বপ্ন দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষে 'শেখ হাসিনার জন্মদিন: প্রদীপ্ত আলোর এক অভিযাত্রী', 'শেখ হাসিনার প্রবাস জীবন' ও 'মাদার অব হিউম্যানিটির নজর সর্বদিকে' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা– ৪, ৭ ও ১০

বাহাদুর শাহ্ পার্ক: সিপাহী বিপ্লবের নীরব সাক্ষী

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে আছে ঢাকার বাহাদুর শাহ্ পার্ক। এই বাহাদুর শাহ্ পার্ক সিপাহী বিপ্লবের নীরব সাক্ষী হয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় কত জানা-অজানা মানুষ বিভিন্ন সময়ে এ জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। এ বিষয়ে প্রবন্ধটি দেখুন পৃষ্ঠা– ১১

আমাদের ছোট নদী ও রবীন্দ্রনাথের পদ্মাপ্রীতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অসংখ্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে গোহালা নদীকে ঘিরে। গুমানী নদীর শাখা গোহালা। স্থানীয়ভাবে গুমানীকে কাচিয়া এবং কৈভাঙ্গার নদীও বলা হয়ে থাকে। আরেক নদী 'নাগর'। নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার লোকজন চলনবিলের এই নদীটিকেই 'ছোট নদী' বলে ডাকেন। জমিদারি দেখভালের জন্য কবি নৌকা যোগে বিভিন্ন জায়গা ঘুরেছেন। কিন্তু শিলাইদহের বালুচর আর পদ্মার কথা ভোলেননি। কবি লিখেছেন– 'পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমন পদ্মা।' আমাদের ছোট নদী ও রবীন্দ্রনাথের পদ্মাপ্রীতি শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা– ১২

পর্যটনে অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পর্যটন শিল্প করপোরেশন গঠন করেছিলেন। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটন খাত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ বিষয়ে নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা– ১৮

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

শেখ হাসিনার জন্মদিন

প্রদীপ্ত আলোর এক অভিযাত্রী

খালেক বিন জয়েনউদদীন

কলকাতায় দাঙা, পাঞ্জাবে রায়ট, নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন, বরিশালের মুলাদিতে হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের প্রেক্ষাপটে লন্ডনের মহারানির উপমহাদেশ বিভক্তি। সাতচল্লিশের ১৪ ও ১৫ই আগস্টে স্বাধীনতা পেল পাকিস্তান ও ভারত। দাঙায় সৃষ্টি হত্যাকাণ্ডে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হলো উভয় অংশের উভয় সম্প্রদায়ের। লাখ লাখ শরণার্থী বাপদাদার ভিটেমাটি ছেড়ে পাড়ি জমাল অজানা পথে। যারা পাকিস্তান চেয়েছিল, তাদের উল্লাসের অন্ত নেই। আর যারা জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বকে ঘৃণা করেছিল তারা হলেন বেদনাহত। নতুন স্বাধীনতা মানুষকে দিল আশা-আকাঙ্ক্ষার বদলে অনিশ্চিত গন্তব্য।

ঠিক এমনই এক পরিবেশে স্বাধীনতার মাত্র চুয়াল্লিশ দিনের মাথায় গোপালগঞ্জ মহকুমার একদম দক্ষিণে পাটগাতী ইউনিয়নের ঘাঘর ও মধুমতী নদীবিধৌত জলে ডোবা এলাকার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনা জন্মগ্রহণ করেন। অজো পল্লি-গাঁয়ের গেরস্ত পরিবারের মেয়ে শেখ হাসিনা। অবশ্য সেকালে তাঁদের পরিবারটি ছিল বনেদি। বাবা ছিলেন কলেজ পড়ুয়া। দাদা লুৎফর রহমান ছিলেন রিটায়ার চাকুরে। শৈশবের দিনগুলো শেখ হাসিনার কেটেছে পাখিডাকা, শাপলাফোটা গ্রামে। আট বছর বয়সে তিনি প্রথম ঢাকা আসেন।

তিনি পড়াশোনা করেন ঢাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কৈশোর থেকেই প্রচণ্ডভাবে রাজনীতি সচেতন। পিতৃগৃহে রাজনৈতিক পরিবেশ এবং বাবার কর্মকাণ্ড তাঁর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। তিনি সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন আন্দোলন, মিছিল, মিটিংয়ে অংশ নিয়েছেন। আটষট্টিতে বিয়ে হলে একদম বাঙালি পরিবারের গৃহবধূ। মাঝে একাত্তরে তার দিনগুলো কেটেছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। বাবা পাকিস্তানের কারাগারে, ভাইরা মুক্তিযুদ্ধে, মা, ছোটো ভাই পাকিস্তানিদের বন্দিখানায়। আবার নিজে সন্তানসম্ভবা। সেই দুর্বিষহ জীবন কেটে যায়, যুদ্ধজয়ের অমানিশা দূর হয় নতুন সুর্যোদয়ে। বাবা (বঙ্গবন্ধু) ফিরে আসেন পাকিস্তানের বন্দিশালা থেকে। শুরু হয় বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার পালা। পঁচাত্তরে শেখ হাসিনা স্বামী বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে চলে যান জার্মানি। সঙ্গে নিয়ে যান সন্তানসহ ছোটো বোন শেখ রেহানাকে।

এরপর শেখ হাসিনা তথা বাঙালির জীবনে এল পনেরোই আগস্ট। আগস্টের খুনিদের কর্মকাণ্ডের কথা আমরা সবাই জানি। খুনিদের পরামর্শদাতা খন্দকার মোশতাক-জিয়ার কথা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ স্মরণ করিয়ে দেয়। আর খুনিদের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করে জিয়া; এই লোকটি বাংলাদেশের খোল নলচে পালটে বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করে। সংবিধানকে বুড়িগঙ্গায় ফেলে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু-প্রেমি মানুষজনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সমূহ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অবৈধভাবে শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষজনের সে এক অমানিশার কাল। দিশেহারা বঙ্গবন্ধুর রক্তেগড়া দল আর তার বেদনাহত প্রিয়জনেরা। এরকম পরিবেশে একাশির সতেরোই মে বুকে শোক ও বেদনার পাথর বেঁধে প্রদীপ্ত আলোর এক অভিযাত্রী হয়ে শেখ হাসিনা দেশে ফেরেন। সম্বিতহারা দেশের মানুষ তখন ফিরে পায় দিশা। অন্ধকার ক্রমশ পরাজিত হতে থাকে আলোর অভিসারে।

এরপর শেখ হাসিনার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিরন্তর সংগ্রাম ও আন্দোলন। ভোট ও ভাতের অধিকার এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে জীবন উৎসর্গ। বিশ-বাইশবার তাঁকে হত্যার অপচেষ্টা। সবকিছু ডিঙিয়ে ছিয়ানব্বইতে ক্ষমতায় আসীন। চারবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সময়ে তিনি সংবিধান থেকে শুরু করে পার্বত্য শান্তিচুক্তি, গঙ্গা নদীর পানিচুক্তি, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ, পদ্মা সেতু নির্মাণ (নির্মাণাধীন), বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার, একাত্তরের খুনিদের বিচার, সমুদ্র, ছিটমহল সমস্যা নিরসন, একুশ ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে জাতিসংঘের স্বীকৃতিসহ কূটনৈতিক সাফল্য তাঁরই দূরদৃষ্টি কর্মকাণ্ডে সফলতা অর্জন করেছে। নিজেও পেয়েছেন জাতিসংঘসহ বিশ্বের তাবৎ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আন্তর্জাতিক সম্মাননা। বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ। আর সেই দেশে মুজিববর্ষ পালন জাতির পিতার প্রতি বাঙালির অশেষ শ্রদ্ধার নির্দশন, যা গৌরবের ও অহংকারের।

পিতার মতো তিনি দেশের মানুষ ও দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। সাধারণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম। দেশের মানুষের কোনো অভাব নেই। খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল। আবার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে মমতাময়ী মায়ের ভূমিকা পালন করেছেন। শেখ হাসিনার তুলনা শেখ হাসিনা। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নসারথি। তাঁর জন্মদিন বাঙালি জনগোষ্ঠীকে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়। তাঁর অভিযাত্রায় আমরা নতুন দিগন্তের সীমানা খুঁজে পাই।

তিনি আমাদের গৌরব। তিনি আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাঁকে ঘিরেই বাংলার জনগণের পথ চলা। তাঁর দীঘল আঁচলের ছায়ায় বাংলাদেশের মাঠঘাট, প্রান্তর এবং সজীব প্রাণিকূল।

শেখ হাসিনা পিতার মতো দেশকে ভালোবাসেন। আর দেশের মানুষও তাঁকে ভালোবাসেন। এদেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে তিনি পাশে দাঁড়ান সাহায্যের ডালি নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নয়, একজন মমতাময়ী মায়ের মতো তাঁর সকল কর্মকাণ্ড। তাঁর স্বপ্ন দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রেরণ তাঁর উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতার পরে আমাদের যত কিছু প্রাপ্তি বা অর্জন, তার মূলে রয়েছে শেখ হাসিনার আকাশছোঁয়া স্বপ্ন। আর কদ্দিন পরে আমরা মেট্রোরেলে চড়ব ও পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যাব। আর ট্রেনে বসে পড়ব তাঁর লেখা রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বইগুলো।

দুঃখকষ্ট, বেদনা ও বিপদের মাঝে শেখ হাসিনা যেমন দৃঢ়চিত্তের অধিকারী, তেমনি প্রচণ্ডভাবে আবেগময়ী। মানুষের ভালোবাসায় তাঁর হৃদয় গলে যায়। তাঁর সত্তরতম জন্মদিনের একটি পুস্তিকায় দেশের নামজাদা ব্যক্তিদের প্রাণঢালা ভালোবাসার নমুনা লক্ষ করেছি। এখানে কিছু বিবরণ তুলে ধরছি–

> ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। এ সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু তাঁরা দেশে ফিরতে পারেননি। মা, বাবা, ভাইসহ আপনজনদের হারানো বেদনাকে বুকে ধারণ করে পরবর্তীতে ৬ বছর লন্ডন ও দিল্লিতে চরম প্রতিকূল পরিবেশে তাঁদের নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ১৯৮১ সালে ১৪-১৬ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এ ছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এক দূরদর্শী সিদ্ধান্ত। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রায় এটা একটি মাইলফলক। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। দেশে ফিরে শেখ হাসিনা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০-এর গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়, বিজয় হয় গণতন্ত্রের।
>
> **মোঃ আবদুল হামিদ**
> **রাষ্ট্রপতি**

তিনি যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা হিসেবে এদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে জমাটবাধা জঞ্জাল পরিষ্কার করতে সময় লেগেছে দীর্ঘ সময়। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, যুদ্ধাপরাধীর বিচার, জঙ্গিবাদের উত্থান ঠেকাতে তাঁকে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে কতবার। জীবনের প্রতি হুমকি সত্ত্বেও তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন সমহিমায়। অর্জন করেছেন সাফল্য। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আজ এক উচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন। দরিদ্রতা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে শুরু করে সমুদ্র বিজয় এই সবই তো শেখ হাসিনার অবদান।

সর্বশেষ মিয়ানমার থেকে জীবন নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা লাখ লাখ রোহিঙ্গাদের প্রতি তিনি যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিরল এক ঘটনা। রোহিঙ্গাদের প্রতি তাঁর ভূমিকায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের দরিদ্রতা দূর হয়েছে, অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রেও। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা পুরো জাতির।

শেখ ফজলুল করিম সেলিম

আমাদের পারিবারিক বন্ধনটি আনন্দময় ছিল। বিশেষ করে আমার মায়ের শাসন, আদর-যত্ন ও ভালোবাসার কোনো তুলনা খুঁজে পাই না। আব্বা রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অধিকাংশ সময় তাঁকে রাজবন্দি হিসেবে দেখেছি। কারাগারে যখন তাঁকে সাক্ষাতের দিন দেখতে যেতাম, তাঁর আদর-স্নেহে আমাদের জড়িয়ে রাখতেন। যখন খুব ছোটো ছিলাম, আমাকে কোলে বসিয়ে রাখতেন। যখন স্কুলে পড়ি তাঁকে দেখতে গিয়ে অনেক খবর জানতাম। কত কথা বলতাম। মাথায় হাত বুলিয়ে কত কথা বলতেন, সেদিন চিঠি লিখে পাঠাতাম। আব্বার অবর্তমানে মা ও হাসু আপা আমাদের কাছে এক বিরাট বটবৃক্ষের মতো ছিলেন। আমাদের চাওয়া-পাওয়া তারাই মেটাতেন। শিশুকাল থেকেই মা আমাদের গল্প শোনাতেন। জীবনে ভালো হয়ে চলার জন্য অনেক কথা শেখাতেন। তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর। হাসু আপা তার কাছ থেকে এ শিক্ষাটা মনে হয় উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছেন।

শেখ রেহানা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যে মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনের স্বপ্ন দেখে আপনি তাঁর পথপ্রদর্শক। জনগোষ্ঠীর অবিরাম পথ চলায় আপনি তাদের পাশে থাকেন। শিশুদের সামনে মনুষ্যত্ব বোধের শিক্ষার আলো ওরা আপনার কাছ থেকে পায়। আপনি ওদের সামনে আলোর শিখা। সার্থক আপনার জন্মদিন। এই দিন শুধু উৎসবের আনন্দ নয়। বহুমাত্রিক চেতনায় ব্যাপ্ত।

দু বছর আগে জন্মদিনের মাত্র কয়েক দিন আগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া আপনার ভাষণে আপনি শিশুদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ব বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন। বলেছিলেন কী অপরাধ ছিল সাগরে ডুবে যাওয়া সিরিয়ার তিন বছর বয়সি নিষ্পাপ শিশু আইলান কুর্দির? কী দোষ করেছিল পাঁচ বছরের শিশু ওমরান, আলেপ্পা শহরে নিজ বাড়িতে বসে বিমান হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে? একজন মা হিসেবে আমার পক্ষে এসব নিষ্ঠুরতা সহ্য করা কঠিন। কিন্তু বিশ্ব বিবেককে কি এসব ঘটনা নাড়া দেবে না?

সেলিনা হোসেন

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে, যুদ্ধাপরাধী, আলবদর, রাজাকার তথা ৩০ লক্ষ মানুষের হত্যাকারী ও লক্ষ লক্ষ নারীর নির্যাতনকারীদের বিচার সমাধা ও অপরাধীদের ফাঁসিও হয়েছে। জেলখানায় চার নেতা হত্যাসহ অন্যান্য অপরাধীদের বিচার কাজও পর্যায়ক্রমে বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। ইত্তকার সব অপরাধীরা ছিল মহাশক্তিশালী। আন্তর্জাতিক শক্তিশালী অনেক দেশ ও নেতারা তাদের বিচারে বাধা দিয়েছিল– অপরাধীদের শক্তি প্রয়োগ, অনেক ভয়-ভীতি, আস্ফালন হুমকিতে শেখ হাসিনা তাঁর মেধার কৌশলী প্রয়োগ করে দিয়ে তাঁর লক্ষ্যে সফল হয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ই জানুয়ারি বঙ্গভবনের দরবার হলে নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শপথ পাঠ করান–পিআইডি

জননেত্রী শেখ হাসিনার শিল্পবোধ, সাংস্কৃতিক চেতনা, সার্বজনীন শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করে একটা জাতিতে বিশ্বের সুশৃঙ্খল ও অনুকরণীয় জাতি হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে প্রধান শক্তি হলো তাঁর সৃষ্টিশীল বোধ, অনুভবের গভীরতা, শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে সততা, শুদ্ধতা সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করা।

হাশেম খান

বাংলাদেশের (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) মানুষ সেই প্রথমবারের মতো সামরিক শাসনের অভিজ্ঞার মধ্যে পড়েছে। সামরিক শাসকরা যাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে, তাদের পরিবার-পরিজনেরও জীবন বিপর্যস্ত করে তারা ক্ষান্ত হয় না, তাদের সঙ্গে যারা কোনোভাবে কোনো সম্পর্ক রাখত তাদেরকেও হয়রানি করতে তাদের বাধত না। এরই ফলে একদিন বেগম মুজিব তাঁর চার সন্তানকে (তখনো রাসেল জন্মগ্রহণ করেনি) নিয়ে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পেলেন। নানা বিবেচনায় তদানীন্তন আওয়ামী লীগের নেত্রী আমেনা বেগম তাকে নিয়ে আমার মায়ের কাছে এলেন। মায়ের হস্তক্ষেপে অ্যাডভোকেট আশরাফ আলী চৌধুরীর (ইনকাম ট্যাক্স অ্যাডভাইজার) সহযোগিতায় বেগম মুজিবকে সেগুনবাগিচায় একটা বাসার ব্যবস্থা করে দেওয়া গেল। সেখানেই মুজিব পরিবারের ভোগান্তির শেষ নয়। হাসিনাকে ছাড়তে হলো স্কুল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে হাসিনা ভর্তি হলো নারী শিক্ষা মন্দির-এ। আমার মা সুফিয়া কামাল বিদ্যালয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাতে সেটা সম্ভব হয়েছিল সহজে। আমারও প্রাথমিক শিক্ষা শুরু নারী শিক্ষা মন্দির-এ লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। হাসিনা আর আমি তৃতীয় শ্রেণি থেকে সহপাঠী হলাম।

সুলতানা কামাল

২৮শে সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনার জন্মদিন। এই তারিখে আজ থেকে ছয় দশকেরও অধিককাল পূর্বে মা-বাবার প্রথম সন্তান হাসিনা জন্মেছিলেন মায়ের কোল আর দাদি-দাদার ঘর আলো করে বাইগার নদীর তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়ার এক সমৃদ্ধ পরিবারে। বাবা শেখ মুজিবুর রহমান তখনো ব্যস্ত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় বিধ্বস্ত কলকাতার মানুষের সুরক্ষার নেতা বাংলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে। টেলিগ্রামের মাধ্যমে খবর পেয়েছিলেন তিনি তাঁর প্রিয় সন্তানের জন্মের। সন্তান জন্মের আনন্দঘন মুহূর্তে পিতার উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন হাসিনা, পরিবারের সবার প্রিয় হাসু। শুধু মা-বাবার প্রথম সন্তান নন তিনি, পরিবারেরও প্রথম সন্তান তিনি। তাই তাঁর জন্ম সমগ্র পরিবারের জন্য এক অনাবিল আনন্দের ঘটনা হয়েছিল। পরিবারের প্রথম কন্যা সন্তান সৌভাগ্যের লক্ষণ, বাংলায় এমন একটি কথা চালু আছে পুরাকাল থেকেই। শেখ হাসিনাও পরিবারের সৌভাগ্যের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছেন, এমনটিই ধারণা করে সমগ্র পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। মা ফজিলাতুন নেছা রেনু ছিলেন পিতৃহীন। দুই বোনের জ্যেষ্ঠা। তিনি চাচাতো ভাই মুজিবের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন মাত্র নয় বছর বয়সে। হাসিনার জন্ম তাঁকে দিয়েছিল শান্তি ও স্বস্তি এবং জীবনের চলার পথের এক অনবদ্য প্রেরণা।

আ. ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

শেখ হাসিনা দেশ ও জাতির একটি সাহসী নাম। দেশ সেবায় তাঁর জীবন নিবেদিত। মানুষের প্রত্যাশাও অপরিসীম। তাঁর সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। তিনি প্রায়ই বলেন: বাবার মতো আমাকেও যদি জীবন উৎসর্গ করতে হয়, আমি তা করতে প্রস্তুত। এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা কেউ উচ্চারণ করতে পারে। আমরাও জানি– তাঁর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। তাঁর অভিযাত্রা আমাদেরকে নিয়ে। আমরা তাঁর ৭৩তম জন্মদিনে দীর্ঘজীবন কামনা করি পরম বিধাতার কাছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

শেখ হাসিনার প্রবাস জীবন

শামস সাইদ

৩০শে জুলাই ১৯৭৫ ঢাকা ছাড়লেন হাসিনা। সঙ্গে ছোটো বোন রেহানা। যাবেন জার্মানি। সেখানে তাঁর স্বামীর কর্মস্থল। ৩১শে জুলাই পৌঁছলেন জার্মানিতে। কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেন। ওয়াজেদ মিয়াও ছুটি নিলেন। ঘুরবেন সারা ইউরোপে। ১৫ই আগস্ট যাবেন প্যারিসে। সেখান থেকে সুইজারল্যান্ডে। ১৩ই আগস্ট বাবা-মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলেন শেখ হাসিনা ও রেহানা। বাড়িতে ফিরে আসার জন্য কান্নাকাটি করছিলেন রেহানা। বাবা বললেন, আমি ওদের বলব– যাতে তুমি তাড়াতাড়ি ফিরতে পার।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দিনটি ছিল শুক্রবার। ভোর ছয়টার দিকে ওয়াজেদ মিয়ার ঘুম ভাঙে বেলজিয়ামে তখনকার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের স্ত্রীর ডাকে। কারণ, জার্মানির বন থেকে সেখানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী টেলিফোনে জরুরি কথা বলতে চাচ্ছেন। হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলার জন্য ওয়াজেদ মিয়া পাঠিয়ে দেন শেখ হাসিনাকে। কিন্তু দুই-এক মিনিট পর ফিরে আসেন শেখ হাসিনা। স্বামীকে জানান যে রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ওয়াজেদ মিয়ার সাথেই কথা বলতে চাচ্ছেন। শেখ হাসিনাকে তখন ভীষণ চিন্তিত এবং উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছিল।

টেলিফোন ধরার জন্য দ্রুত নিচে নামেন ওয়াজেদ মিয়া। তখন সেখানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় মাথা নিচু করে পায়চারি করছিলেন সানাউল হক। ফোনের রিসিভার ধরতেই অপর প্রান্ত থেকে রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী বলেন, 'আজ ভোরে বাংলাদেশে ক্যু হয়ে গেছে। আপনারা প্যারিস যাবেন না। রেহানা ও হাসিনাকে এ কথা জানাবেন না। এক্ষুনি আপনারা আমার এখানে বনে চলে আসুন।' ১৫ই অগাস্ট শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানাকে নিয়ে ড. ওয়াজেদ মিয়ার ব্রাসেলস থেকে প্যারিস যাওয়ার কথা ছিল। টেলিফোনে কথা বলার পর ওয়াজেদ মিয়া যখন বাসার উপরে যান তখন শেখ হাসিনা অশ্রুজড়িত কণ্ঠে ওয়াজেদ মিয়ার কাছে জানতে চান রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে। ওয়াজেদ মিয়া তা বলেন না।

কিছুক্ষণ পর বিমর্ষ মনে ওয়াজেদ মিয়া জানালেন রাষ্ট্রদূত চৌধুরী তাদের প্যারিস যাত্রা বাতিল করে আজই জার্মানির বনে ফিরে যেতে বলেছেন। শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে বলেন, নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ আছে, যা ওয়াজেদ মিয়া তাদেরকে বলতে চাইছেন না। তখন শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা বলেন– প্যারিসের যাত্রা বাতিল করার কারণ পরিষ্কারভাবে না বললে তাঁরা সে বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন না। বাধ্য হয়ে ওয়াজেদ মিয়া বলেন বাংলাদেশে কী একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। যার জন্য আমাদের প্যারিস যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। এ কথা শুনে তারা দুবোন কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাদের কান্নায় ছেলেমেয়েদেরও ঘুম ভেঙে যায়।

সকাল সাড়ে দশটার দিকে ব্রাসেলস ছেড়ে জার্মানির বনের উদ্দেশে রওনা হলেন তাঁরা। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর বাসায় পৌঁছান।

সেদিন বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন যুগোশ্লাভিয়া সফর শেষে বাংলাদেশে ফেরার পথে ফ্রাঙ্কফুর্টে যাত্রাবিরতি করেন এবং পরে রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর বাসায় ওঠেন। ড. কামাল হোসেন, হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী-এ তিন জন মিলে কান্নায় ভেঙে পড়া শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে ধরাধরি করে বাসার ভেতর নিয়ে যান।

তখন ড্রইং রুমে বসে ড. কামাল হোসেন, হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী এবং ওয়াজেদ মিয়া উৎকণ্ঠিত অবস্থায় বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও অন্যান্য রেডিও স্টেশন থেকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। এরই এক ফাঁকে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীকে ঘরের বাইরে নিয়ে ওয়াজেদ মিয়া ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। নিরাপদ স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানাকে কোনো কিছু জানানো হবে না– এই শর্তে রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ওয়াজেদ মিয়াকে বলেন, 'বিবিসি'র এক ভাষ্যানুসারে রাসেল ও বেগম মুজিব ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই এবং ঢাকাস্থ ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক প্রচারিত এক বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউ বেঁচে নেই।'

১৬ই অগাস্ট ড. কামাল হোসেন লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রার জন্য বন বিমানবন্দরে যান। বিমানবন্দর থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ওয়াজেদ মিয়া ড. কামাল হোসেনকে একটি অনুরোধ করেন। তাঁর হাত ধরে ওয়াজেদ মিয়া বলেন, 'খন্দকার মোশতাক আহমদ খুব সম্ভবত আপনাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাখার চেষ্টা করবেন। অনুগ্রহ করে আমার কাছে ওয়াদা করুন যে, আপনি কোনো অবস্থাতেই খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে আপোশ করে তাঁর মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করবেন না।'

ড. কামাল হোসেন তখন ওয়াজেদ মিয়াকে যে উত্তর দিয়েছিলেন সেটি ছিল এরকম, 'ড. ওয়াজেদ, প্রয়োজন হলে বিদেশেই মৃত্যুবরণ করতে রাজি আছি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আপোশ করে আমি দেশে ফিরতে পারি না।'

১৬ই অগাস্ট রাত ১১টার দিকে রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী এবং তার স্ত্রী ওয়াজেদ মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যান। উদ্দেশ্য ছিল ওয়াজেদ মিয়াকে ভারতীয় দূতাবাসের এক কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। নির্ধারিত স্থানে ভারতীয় দূতাবাসের সেই কর্মকর্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী সেখান থেকে চলে যান। তখন ভারতীয় দূতাবাসের ঐ কর্মকর্তা ওয়াজেদ মিয়াকে রাষ্ট্রদূতের বাসায় নিয়ে যান। তখন জার্মানিতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত ছিলেন একজন মুসলমান সাংবাদিক।

আলোচনার এক পর্যায়ে রাষ্ট্রদূত ওয়াজেদ মিয়াকে বলেন যে, ভারত সরকারের কাছে তারা ঠিক কী চান, সেটি লিখে দিতে। একথা বলে রাষ্ট্রদূত একটি সাদা কাগজ ও কলম এগিয়ে দিলেন ওয়াজেদ মিয়ার দিকে। সেই কাগজে ওয়াজেদ মিয়া যা লিখেছিলেন, 'শ্যালিকা রেহানা, স্ত্রী হাসিনা, শিশু ছেলে জয়, শিশু মেয়ে পুতুল এবং আমার নিজের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং প্রাণরক্ষার জন্য ভারত সরকারের নিকট কামনা করি রাজনৈতিক আশ্রয়।'

সেই কঠিন সময়ে ওয়াজেদ মিয়া, শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানার হাতে কোনো টাকা ছিল না। শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা দুজনেই ২৫ ডলার সঙ্গে নিয়ে দেশ থেকে এসেছিলেন।

রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ওয়াজেদ মিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের কোনো টাকা-পয়সা লাগবে কি-না?

শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলে ওয়াজেদ মিয়া জানান, হাজার খানেক জার্মান মুদ্রা দিলেই তাঁরা মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবেন।

১৮ই আগস্ট বন শহর থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দূরে কার্লসরুয়ে শহরে যান ওয়াজেদ মিয়া, শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা। সেখানে গবেষণা সংক্রান্ত কিছু কাগজ এবং বই ছিল ওয়াজেদ মিয়ার। এছাড়া আরো কিছু কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজন ছিল।

২৩শে আগস্ট সকালে ভারতীয় দূতাবাসের এক কর্মকর্তা ওয়াজেদ মিয়াকে টেলিফোন করে জানান যে, ভারতীয় দূতাবাসের একজন ফার্স্ট সেক্রেটারি কার্লসরুয়েতে তাদের সাথে দেখা করবেন।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

সেদিন দুপুর দুটার দিকে ঐ কর্মকর্তা ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, পরের দিন অর্থাৎ ২৪শে আগস্ট সকাল নয়টায় তাদের ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় দূতাবাসের ঐ কর্মকর্তা ২৪শে আগস্ট তাদের ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে নিয়ে যান। তবে তাদের গন্তব্যের বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে করে ২৫শে আগস্ট সকাল সাড়ে আটটার দিকে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পৌছান শেখ রেহানা, শেখ হাসিনা, ওয়াজেদ মিয়া এবং তাদের দুই সন্তান।

ভারত সরকারের দুই কর্মকর্তা দুপুরের দিকে তাদেরকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যান নয়াদিল্লির ডিফেন্স কলোনির একটি বাসায়। ঐ বাসায় ছিল একটি ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম এবং দুটো শয়নকক্ষ- যার প্রত্যেকটির সাথে একটি করে বাথরুম। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে সেখানে রাখা হয়েছিল তাদের। বাইরের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো উপায় ছিল না। ঐ বাড়ির বাইরে না যাওয়া, সেখানকার কারো কাছে তাদের পরিচয় না দেওয়া এবং দিল্লির কারো সাথে যোগাযোগ না রাখা- ভারতের কর্মকর্তারা তাদের এই তিনটি পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ভারতে তখন জরুরি অবস্থা চলছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে তেমন কোনো খবরাখবর ভারতের পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে না। কাজেই তখনকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন ওয়াজেদ মিয়া, শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা। এভাবেই তাদের কেটে যায় প্রায় দুসপ্তাহ। ইতোমধ্যে ভারত সরকারের একজন যুগ্ম-সচিব শেখ হাসিনা এবং ওয়াজেদ মিয়াকে জানান যে তাদের একটি বিশেষ বাসায় নেওয়া হবে গুরুত্বপূর্ণ এক সাক্ষাৎকারের জন্য। সেদিন রাত আটটায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে ওয়াজেদ মিয়া এবং শেখ হাসিনা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাসায় পৌছান।

প্রায় দশ মিনিট পরে ইন্দিরা গান্ধী কক্ষে প্রবেশ করে শেখ হাসিনার পাশে বসেন। এরপর ইন্দিরা গান্ধী ওয়াজেদ মিয়ার কাছে জানতে চান, ১৫ই আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে তারা পুরোপুরি অবগত রয়েছেন কি-না।

জবাবে ওয়াজেদ মিয়া রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশিদ চৌধুরীর বরাত দিয়ে রয়টার্স পরিবেশিত এবং ঢাকাস্থ ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক প্রচারিত দুটো ভাষ্যের কথা উল্লেখ করেন।

তখন ইন্দিরা গান্ধী সেখানে উপস্থিত এক কর্মকর্তাকে ১৫ই আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য জানাতে বলেন।

তখন ঐ কর্মকর্তা ইন্দিরা গান্ধীকে জানান যে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের কেউ-ই বেঁচে নেই।

এই সংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন ইন্দিরা গান্ধী। বলেন 'তুমি যা হারিয়েছ, তা আর কোনোভাবেই পূরণ করা যাবে না। তোমার একটি শিশু ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। এখন থেকে তোমার ছেলেকেই তোমার আব্বা এবং মেয়েকে তোমার মা হিসেবে ভাবতে হবে।'

এছাড়াও তোমার ছোটো বোন ও তোমার স্বামী রয়েছে তোমার সঙ্গে। এখন তোমার ছেলেমেয়ে ও বোনকে মানুষ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে। অতএব, এখন তোমার কোনো অবস্থাতেই ভেঙে পড়লে চলবে না।'

এরপর ইন্ডিয়া গেটের কাছে পান্ডারা রোডে একটা দোতলা বাড়ির ওপর তলার একটা ফ্ল্যাট দেওয়া হয় তাদের থাকার জন্য। কয়েকদিন পরে সেখানে আসেন শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল। শেখ পরিবারের জন্য বাংলাদেশে তখন অনুকূল পরিবেশ ছিল না। শেখ ফজলুল হক মণির দুই ছোটো ভাই শেখ সেলিম ও শেখ মারুফও কলকাতায় আশ্রয় নেন। দমদম বিমান বন্দরের কাছে ভাঙ্গর নামক একটা জায়গায় তাদের বাসা ছিল। পরে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ হলো শেখ হাসিনা ও রেহানার। এরপর দীর্ঘ ছয় বছর বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন হারিয়ে নানা দুঃখকষ্টে কাটে নির্বাসিত জীবন। বেশ কিছুদিন পর একটু স্বাভাবিক হলেন। মাঝে মাঝে দলীয় নেতাকর্মীরা যেতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সব ভুলে শুনতে চাইতেন আওয়ামী লীগের কথা। আব্বা সারাজীবন আওয়ামী লীগ করেছেন। আব্বা আজ নাই, তাঁর আওয়ামী লীগ আছে। আওয়ামী লীগকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মন চায় দেশে ছুটে আসতে। ৩২ নম্বরে গিয়ে সেই বাড়িটার সামনে দাঁড়াতে। ছটফট করছে হৃদয়ের মাঝে। যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠছে প্রবাস জীবন। তবুও ফিরতে পারছেন না দেশের মাটিতে।

১৯৭৯ সালের ৮ই মে সুইডেনস্থ বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটি ৩ দিনের এক মহাসম্মেলন করে। সেখানে প্রথম কোনো রাজনৈতিক বাণী প্রেরণ করেন শেখ হাসিনা, যা পড়ে শোনান তাঁর বোন শেখ রেহানা। ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে লন্ডন যান। ১৬ই আগস্ট লন্ডনের ইয়ার্ক হলে বঙ্গবন্ধুর পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ প্রদান করেন শেখ হাসিনা। সেদিন তিনি বলেছিলেন, '১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলার মাটিতে যে কলঙ্কিত অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ঘটে আপনারা তা সব জানেন। আমরা দুটো বোন সে সময় বিদেশের মাটিতে ছিলাম, তাই ঘাতকের আঘাত থেকে বেঁচে যাই। এ বাঁচা আমাদের জন্য কোনো সুখকর বাঁচা নয়। আমরা অনেক বেশি শান্তি পেতাম যদি সকলের সঙ্গে একইসঙ্গে মরতে পারতাম।

ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে আমরা হারিয়েছি আমাদের স্নেহময় মাতা-পিতাকে, অতি আদরের ছোটো ভাই কামাল, জামাল ও রাসেলকে। খুনিরা নব-পরিণীতা বউ দুটোকেও রেহাই দেয় নাই। তাদের হাত তখনো ছিল মেহেদি রাঙানো। বুকে ছিল ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন। রেহাই দেয় নাই আমার বাবার একমাত্র ছোটো ভাই শেখ নাসেরকে। সবার শেষে সব থেকে অত্যাচার করে হত্যা করেছে রাসেল সোনাকে– কিন্তু কেন? ও প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল। দশ বৎসরের ছোট্ট শিশুকেও কি নিষ্ঠুর হত্যাকারীরা ভয় পেয়েছিল? আমি আপনাদের কাছে তথা বিশ্ববাসীর কাছে জানতে চাই কেন, কেন আমার রাসেল সোনাকে এভাবে তারা হত্যা করল?

আপনারা শুনেছেন, চারজন জাতীয় নেতাকে কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সভ্য জগতে এই জঘন্য ঘটনার নজির খুঁজে পাওয়া ভার। তারা ছিলেন আমার বাবার ঘনিষ্ঠ সহযোগী, স্বাধীনতা সংগ্রামের অতন্দ্রপ্রহরী। তারা ১৫ই আগস্টের ঘটনাকে মেনে নিতে পারেন নাই। খুনি মোশতাকের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন। মিনিস্টার হবার পরিবর্তে জেলে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেন, খুনিদের সহযোগিতা না করে মৃত্যুকে বরণ করে নেন। বেঁচে থাকতেও তারা আমার বাবার সঙ্গে ছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়েও একাত্মতা প্রমাণ করে গেছেন।

আমার বাবা ভালোবেসেছিলেন দেশকে, তথা দেশের মানুষকে, দেশের গরিব সাধারণ মানুষকে, তাদের ভালোবাসাও ছিল তাঁর প্রতি অপরিসীম। বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের দুঃখ-দুর্দশাই তাঁকে ঘর থেকে সংগ্রামের পথে টেনে আনে। বাংলার মানুষের কাছে তিনি ছিলেন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তিনি চেয়েছিলেন বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে তুলে দিতে দুমুঠো অন্ন। তাদের আদুল গায়ে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দিতে।

১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই স্বাধীনতাবিরোধী চক্রই আজ পিতৃহত্যার কলঙ্ক সমগ্র বাঙালি জাতির কপালে লেপন করেছে। জাতির জন্য এটা অত্যন্ত অসম্মান হবে যদি এই হত্যার প্রতিশোধ না নিতে পারে।

আপনারা জানেন পাকিস্তান শাসকচক্র শেখ মুজিবের সঙ্গে অনেকবার আপোশ করার চেষ্টা করেছে। ইচ্ছে করলে ষড়যন্ত্র কিংবা আপোশের মধ্য দিয়ে আব্বা অনেকবার ক্ষমতায় যেতে পারতেন। তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হতো না। কিন্তু তিনি তা করেননি। বাংলার মানুষের স্বাধিকার-সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন সকল লোভ-লালসার উর্ধ্বে। ১৯৪৯ থেকে পর্যায়ক্রমে আন্দোলন ও জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেই বঙ্গবন্ধু ও জাতির পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

অতএব স্বাধীনতা অর্জনের পর একদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকতে পারে না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বাঙালি জাতির সম্পর্ক এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব সূত্রে গাথা। বিপ্লবের পর বিপ্লবী নেতা সকল দেশেই এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবার প্রাথমিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সহযোগিতায় তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

বিদেশি শক্তির সহযোগিতায় বিভিন্ন পর্যায়ে আজ যারা ক্ষমতা দখল করে আছে তারা যতই গণতন্ত্রের লেবাস পরতে চেষ্টা করুন না কেন, সাধারণ মানুষকে আজ ধোকা দিতে পারবে না। যে আদর্শের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল যে-কোনো প্রকারে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সে আদর্শকে তারা একের পর এক জলাঞ্জলি দিচ্ছে। আমি আপনাদের কাছে আকুল আবেদন জানাই, এই স্বৈরাচার ক্ষমতা দখলকারীকে হটিয়ে দেশকে বাঁচান, দেশের দীন দুঃখী মানুষকে বাঁচান।

আমি বাংলার মানুষের কাছে, বিশ্বমানবতার কাছে বিচার চাই– কেন আমার বাবা-মার স্নেহ বঞ্চিত, কেন আজ আমি ভাই হারা, দেশ ছাড়া, আমি আপনাদের কাছে বিচার চাই, বিচার চাই বিশ্ববাসীর কাছে। আমি চাই খুনিদের বিচার জনগণের আদালতে হোক।'

এই ভাষণে শেখ হাসিনা নিজেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরেন। তুলে ধরেন দেশের চিত্র। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হওয়া একটা দেশ এভাবে চলতে পারে না।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

শেখ হাসিনার আন্তর্জাতিক পদকের সংখ্যা ৩৭টি

ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ অর্জনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পদকের সংখ্যা ৩৭-এ উন্নীত হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের প্রধান উপদেষ্টা অ্যাম্বাসাডর টি পি শ্রীনিবাসন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ পদক হস্তান্তর করেন। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও পারস্পরিক সন্তোষজনক সম্পর্ক, নিজ দেশের জনগণের কল্যাণ, বিশেষ করে নারী ও শিশু এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতায় তাঁর অঙ্গীকারের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আবদুল কালামের স্মৃতির স্মরণে প্রবর্তিত এ পদক দেওয়া হয়। চলতি বছরের মার্চে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-এ ভূষিত করা হয়। বার্লিনে ৭ই মার্চ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন প্রদত্ত এ পদক গ্রহণ করেন জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমতিয়াজ আহমেদ। নারীর ক্ষমতায়ন ও দক্ষিণ এশিয়ায় অনন্য নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে শেখ হাসিনাকে এ পদক দেওয়া হয়। এর আগে বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র সমুন্নত ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন পর্যায়ের পদক প্রদান করে। শেখ হাসিনা সমাজসেবা, শান্তি ও স্থিতিশীলতায় অসাধারণ ভূমিকার জন্য পদক অর্জনের মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে দায়িত্বশীল নীতি ও তাঁর মানবিকতার জন্য প্রধানমন্ত্রী আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১৮ সালে স্পেশাল ডিসটিংশন অ্যাওয়ার্ড ফর লিডারশিপ গ্রহণ করেন। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নিউজ এজেন্সি 'দি ইন্টার প্রেস সার্ভিস (আইপিএস)' এবং নিউইয়র্ক, জুরিখ ও হংকংভিত্তিক তিনটি অলাভজনক ফাউন্ডেশনের নেটওয়ার্ক গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন গত বছরের ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীকে দুটি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করে। বাংলাদেশে নারী শিক্ষা ও উদ্যোক্তা তৈরিতে অসামান্য নেতৃত্বদানের জন্য গত বছরের ২৭শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গ্লোবাল সামিট অব উইমেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে এক ভোজসভায় মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মাননা জানায়। সম্মেলনে অংশ নেওয়া বিশ্বের প্রায় ১৫০০ জন নারী নেতৃত্বের উপস্থিতিতে গ্লোবাল সামিটের প্রেসিডেন্ট আইরিন নাতিভিদাদের কাছ থেকে তিনি গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।

প্রতিবেদন: মোহাম্মদ খালিদ হোসেন

মাদার অব হিউম্যানিটির নজর সর্বদিকে

আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

দেশের কারাগারগুলোতে ১৮ শতকের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের নির্ধারিত নাস্তার মেনুতে পরিবর্তন এসেছে। আমাদের দেশের জেলখানার সকালের নাস্তার মেনু ২০০ বছরের পুরোনো। সরকারের উদ্যোগে জেল কর্তৃপক্ষ দেশের কারা ব্যবস্থা সংস্কারের অংশ হিসেবে দেশের কারাগারে নতুন মেনু চালু করেছে। দেশের ৮১ হাজারেরও বেশি বন্দিদের পূর্বের তুলনায় উন্নতমানের নাস্তা দেওয়া হচ্ছে। ২০০ বছর পূর্বে নির্ধারিত ১১৬ গ্রাম পরিমাণ রুটি এবং ১৪.৫ গ্রাম গুড়ের পরিবর্তে নতুন খাদ্য তালিকায় রয়েছে রুটি, সবজি, মিষ্টি এবং খিচুড়ি।

অপরাধীর জন্য জেলখানা– কথাটি সত্য হলেও 'সবার উপরে মানুষ' হিসেবে মানবাধিকারের বিষয়টিও আমাদের মাথায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে। ভুল করা, অপরাধ করা মানুষকে আমরা একবারের জন্য সমাজচ্যুত করতে পারি না। মানুষকে ভুল ও অপরাধ সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে কারণ আমৃত্যু আমরা তাদেরকে সমাজের বাইরে রাখতে পারি না। আর অপরাধেরও রকমফের আছে, ছোটো-বড়ো সব অপরাধের শাস্তির পরিমাণও এক হতে পারে না। অনেকেই রাগের বশে অপরাধ করে ফেললেও পরে তারা বিবেকের কাছে দংশিত হয়, বুঝতে পারে এরকম করাটা ঠিক হয়নি। তাই তারা সাময়িক সাজা খাটার পর নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়। এজন্য নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে থেকে আমাদেরকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে হবে, যা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

অপরাধ প্রবণতা বিবেচনায় দেশে ৩৫ হাজার কয়েদির জন্য ৬০টি কারাগার থাকলেও ৮১ হাজারেরও বেশি কয়েদিদের এখানে বসবাস যা সত্যিই মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে বলে বিশেষভাবে সর্বমহলে সমালোচিত। আর অতিরিক্ত এ অপরাধীর জন্য জেলখানায় খাবারের ব্যবস্থাপনা যে অপ্রতুল, তার ওপর খাবারের মান ও পরিমাণ নিয়েও অভিযোগ আছে এবং অভিযোগ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। তাই সকলের দৃষ্টিতে সরকারের এ নাস্তার মেনু পরিবর্তনের বিষয়টি প্রশংসিত হয়েছে। যদিও ২০০ বছরে কেন এই মেনু পরিবর্তন হয়নি এ প্রশ্ন আজ সবার মুখে মুখে। তবে বর্তমান সরকারের সময়ে যে এই পরিবর্তন এল, তা সত্যিই সরকারের জন্য প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে কারাগারের মহাপরিচালক বলেন, খাদ্য পরিবর্তন একটি ধারাবাহিক সংস্কারের অংশ। এর উদ্দেশ্য 'বন্দিদের অনুপ্রেরণা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা।' তিনি বলেন, অপরাধীদের ধীরে ধীরে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে তারা জেলে থাকার সময় নিজেদেরকে সংশোধন করতে পারে। সরকার ইতোমধ্যে সস্তায় কারাগারে বন্দিদের জন্য টেলিফোন সেবাও চালু করেছে। এখন বন্দিরা ফোনের মাধ্যমে তাদের পরিবারের সাথে কথা বলতে পারে।

মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মেধাবী ও অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় বৃত্তি, অসচ্ছল ভূমিহীনদের খাস জমি প্রদানসহ পুনর্বাসন, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, কৃষকের সময়মতো সার, বীজ ও কীটনাশক সরবরাহসহ নামমাত্র সুদে কৃষিঋণ সুবিধা প্রদানসহ নানাবিধ ভালো কাজের পাশাপাশি জেলখানায় কয়েদিদের নাস্তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্তন এসেছে তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অন্যান্য জরুরি বিষয়ের প্রতি আমাদের করণীয় নির্ধারণে উৎসাহিত করবে বলে আমরা আশাবাদী।

লেখক: কলামিস্ট

ডিপ্লোম্যাট ম্যাগাজিনে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রকাশ

নেদারল্যান্ডসের প্রথিতযশা পত্রিকা *ডিপ্লোম্যাট* ম্যাগাজিনের চলতি সংখ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে 'শেখ হাসিনা: দ্য মাদার অব হিউম্যানিটি' শিরোনামে কভার স্টোরি (প্রচ্ছদ নিবন্ধ) প্রকাশ করেছে। চলতি সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিপ্লোম্যাটিক কোরের সদস্যবৃন্দ, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকর্মী, থিঙ্ক ট্যাঙ্কস, ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে চীন, মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ইরান, দক্ষিণ-কোরিয়া, উজবেকিস্তান, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, মরক্কো, তিউনিসিয়া, অ্যাঙ্গোলা, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, লক্সেমবার্গ, ইউক্রেন, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, ভ্যাটিকান, ফসোভো, ব্রাজিল, কিউবা, পেরু, চিলি, ভেনিজুয়েলা এবং ইকুয়েডরের রাষ্ট্রদূতগণ, রাশিয়ান ফেডারেশন, জর্জিয়া, আর্জেন্টিনা এবং আজারবাইজেনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতগণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কেনিয়া, পোল্যান্ড এবং পানামা দূতাবাসের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় *ডিপ্লোম্যাট* ম্যাগাজিনের প্রকাশক মেইলিন ডি লারা এবং নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শেখ মুহম্মদ বেলাল উপস্থিত রাষ্ট্রদূতগণদের সঙ্গে নিয়ে পত্রিকাটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

রাষ্ট্রদূত বেলাল প্রচ্ছদ হিসেবে মানবতার কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ প্রধানমন্ত্রীর 'মাদার অব হিউম্যানিটি' সংক্রান্ত খবরকে বেছে নেওয়ার জন্য *ডিপ্লোম্যাট* ম্যাগাজিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপস্থিত সকলকে জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশে আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়ার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লাখ লাখ নির্যাতিত মানুষের জীবন রক্ষা করে বিশ্ববাসীর কাছে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' হিসেবে পরিচিত লাভ করেছেন, আর তাই নেদারল্যান্ডসের *ডিপ্লোম্যাট* ম্যাগাজিনে স্থান পেয়েছেন।

প্রতিবেদন: রুমি ইসলাম

বাহাদুর শাহ্ পার্ক: সিপাহী বিপ্লবের নীরব সাক্ষী

মো. আলী হোসেন

পুরানো ঢাকা সদরঘাটের সন্নিকটে বাহাদুর শাহ্ পার্ক অবস্থিত। এর পশ্চিমে সাবেক স্টেট ব্যাংক ভবন ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। উত্তর-পশ্চিমে জেলা আদালত, পূর্বে লক্ষ্মীবাজার, দক্ষিণে নর্থব্রুক হল রোড ও বাংলা বাজার। এর পূর্ব নাম ছিল ভিক্টোরিয়া পার্ক। এখানে আগে মোগল আমলে নির্মিত একটি জরাজীর্ণ ভবন ছিল। ১৮৫৭ সালে ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী ঢাকার লালবাগ কেল্লার ধৃত বিদ্রোহী সিপাহীদেরকে এই পার্কে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই দৃশ্য জনসাধারণের মনে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার করে। এই নারকীয় ঘটনার পর থেকে এই স্থানটির পরিচিতি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত এটি ছিল জঙ্গলে পূর্ণ। মোগল আমলের একটি জরাকীর্ণ ভবন তখন পর্যন্ত মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে স্থানীয় আর্মেনীয়রা জঙ্গল ও ভবনটি পরিষ্কার করে এটিকে ক্লাব ঘরে রূপান্তরিত করে। আর্মেনীয়রা নিয়মিত এই ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলত। বিলিয়ার্ডের ডিম্বাকৃতির বল অনুসারে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্লাবটিকে 'আণ্ডাঘর' বলত। আর ক্লাব সংলগ্ন মাঠকে 'আণ্ডাঘরের মাঠ' বলত। সিপাহী বিপ্লবের সামান্য পূর্বে খাজা আব্দুল গনি ব্রিটিশদের সহযোগিতায় স্থানটির সংস্কার সাধন করে ভিক্টোরিয়া পার্কের পত্তন করেন। সিপাহী যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ সৈনিকদের বিজয় চিহ্ন স্বরূপ মহারানি ভিক্টোরিয়ার নামানুসারে পার্কের নাম 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' রাখা হয়।

১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই পার্কটি রানি ভিক্টোরিয়ার নামানুসারেই পরিচিত ছিল। ঐ বছরই স্থানটি সংস্কার সাধন করে সিপাহী বিপ্লবের শহিদ বীরদের স্মৃতির উদ্দেশে একটি শহিদমিনার নির্মাণ করা হয়। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ এসব বীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিপাহী যুদ্ধের ঐক্যের প্রতীক বাহাদুর শাহ্ জাফরের নামানুসারে এই জায়গাটির নাম ভিক্টোরিয়া পার্কের স্থলে 'বাহাদুর শাহ্ পার্ক' রাখা হয়। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে আছে ঢাকার বাহাদুর শাহ্ পার্ক। এই বাহাদুর শাহ্ পার্ক সিপাহী বিপ্লবের নীরব সাক্ষী হয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় কত জানা-অজানা মানুষ বিভিন্ন সময়ে এ জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইংরেজরা ভারতীয় সিপাহী-জনতার এই স্বাধীনতা যুদ্ধকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করে এর অবমূল্যায়ন করতে চেয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতে সিপাহী বিপ্লব ছিল পলাশী যুদ্ধের প্রহসন পরবর্তী এক শতাব্দীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের মানুষের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ। এর প্রথম সূত্রপাত হয় ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে। নতুন এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজের গ্রিজে গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে–এ সংবাদ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই গ্রিজ ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহরমপুর ও বারাকপুরের সিপাহীরা প্রতিবাদ করে। স্মরণ করা যেতে পারে, এ সময় ভারতীয় ব্রিটিশ বাহিনী বাংলা, বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) ও মাদ্রাজ– এই তিনটি প্রেসিডেন্সি রেজিমেন্টে বিভক্ত ছিল। বাংলা বাহিনী ছিল বৃহত্তম। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৭০ হাজার। বাংলার পূর্বাঞ্চলের হেডকোয়ার্টার ছিল জলপাইগুড়িতে। লালবাগ দুর্গের সিপাহীরা জলপাইগুড়ি রেজিমেন্টের অধীনে ছিল। ১৮৫৭ সালে কোম্পানির দেশীয় সৈনিকেরা এক অভ্যুত্থান ঘটায়। উত্তর ভারতের নানা স্থানে সিপাহী জনতার বিদ্রোহ ঘটতে থাকে। ১৮৫৭ সালের ১১ই মে মিরাটের সম্পূর্ণ সিপাহী গ্যারিসন বিদ্রোহ করে ব্রিটিশ অফিসারদের হত্যা করে দ্রুত দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করে। দিল্লি পৌঁছাবার সাথে সাথে দিল্লি গ্যারিসনও তাদের সাথে যোগ দেয়। তারা সমবেতভাবে দিল্লির লালকেল্লায় যান এবং ব্রিটিশ পেনশনভোগী সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরকে ভারতের সম্রাট ঘোষণা করে দিল্লির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। দিল্লি দখলের সংবাদ পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অংশের সিপাহীরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়। অতঃপর ২১শে মে আলীগড়, ৩১শে মে বেরিলি ও লক্ষ্মৌ, ৪ঠা জুন কানপুর, ৬ই জুন এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে এবং বিভিন্ন পথে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করে।

এভাবে সারা ভারতে বিদ্রোহ বিস্তার ঘটলেও যোগাযোগ ও সুযোগের অভাবে বাংলায় এ বিদ্রোহ তৎক্ষণাৎ সংগঠিত হতে পারেনি। ১৮৫৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ইংরেজদের নেতৃত্বে ইংরেজ, গুর্খা ও শিখদের সাহায্যে ইংরেজ বাহিনী যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালায় তা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৫৯ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সিপাহী বিদ্রোহ বিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত ছিল। ঢাকায় বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ইংরেজদের হাতে দিল্লি পতনের ২ মাস পর। ঢাকার সিপাহী বিদ্রোহের সাথে বাহাদুর শাহ্ পার্কের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তখন ঢাকা ও আসাম অঞ্চলের হেডকোয়ার্টার ছিল জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ির সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে বলে ১২ই জুন ঢাকায় গুজব রটে। লালবাগের দুই কোম্পানি সিপাহীও শিগগিরই গুর্খা ও ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে বলে গুজব রটে। ব্রিটিশ সেনারা জলপাইগুড়ির নেতৃত্বস্থানীয় সৈনিকদের বন্দি করে এবং অনেককে গুলি করে হত্যাও করে। এদিকে ল্যাফটেন্যান্ট লুইসের নেতৃত্বাধীন ৮৫ জন গুর্খা নৌ সেনা আগস্ট মাস থেকে লালবাগ কেল্লা অবরোধ করে রাখে। চট্টগ্রামে অবস্থানরত ৩৪তম দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সিপাহীরা হাবিলদার রজন আলীর নেতৃত্বে ১৮ই নভেম্বর বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু ইংরেজদের পদলেহী আরেক দল সিপাহীর কাছে হেরে গিয়ে মুক্তিকামী সিপাহীরা সিলেট হয়ে আসাম চলে যায়। ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকায় চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছলে পরের দিন ২২শে নভেম্বর লালবাগের সিপাহীদের নিরস্ত্র ও বন্দি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২২শে নভেম্বর সকালে লেফটেন্যান্ট লুইসের নেতৃত্বে ৮৫ জন গুর্খা সৈন্য, ২টি কামান, ইংরেজ নাবিক ও ইংরেজ সৈন্যসহ একটি দল সিপাহীদের নিরস্ত্র করতে শুরু করে। প্রথমে অস্ত্রগুদামে আক্রমণ চালিয়ে পাহাড়াদার বাঙালি সিপাহীদেরকে বন্দি করা হয়। এমনিভাবে তারা বিনা উস্কানিতে লালবাগ দুর্গ আক্রমণ অব্যাহত রাখে ও সিপাহীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। এই আকস্মিক আক্রমণে সিপাহীরা হতভম্ব না হয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকে। স্বল্পসংখ্যক অস্ত্র ও সামান্য গোলাবারুদ নিয়ে সিপাহীরা ইংরেজদের বিপুল অস্ত্রের বিরুদ্ধে সারাদিন যুদ্ধ করে। এই অসম যুদ্ধে ৪১ জন সিপাহী নিহত হন। মারাত্মকভাবে আহত হন বহু সিপাহী, পানিতে গুলিবিদ্ধ হয়েও মারা যায় অনেকে। সিপাহীরা দুর্গের দেয়াল ছিদ্র করে বের হয়ে পড়লে গুর্খা সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে অনেকে নিহত হন এবং অনেকে আহত অবস্থায় ধৃত হন। বাকিরা ব্রিটিশ সৈন্যদের বাধা অতিক্রম করে জলপাইগুড়ির দিকে পালিয়ে যায়। ২২শে নভেম্বর এবং পরবর্তী পর্যায়ে লালবাগ দুর্গের যে সকল সিপাহীকে বন্দি করা হয় তাদেরকে এক প্রহসনমূলক বিচারের সম্মুখীন করা হয়। বর্তমান বাহাদুর শাহ্ পার্কের অদূরে জজের কাছারীতে এক প্রহসনমূলক বিচারে কোর্টমার্শালের ক্ষমতাবলে তাদেরকে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে বর্তমান বাহাদুর শাহ্ পার্কের গাছে ঝুলিয়ে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। এর আগে ইংরেজ নৌ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী স্থানটি ঘিরে রাখে। ফাঁসির আগে তাদের নির্দোষ প্রমাণের সামান্য কোনো সুযোগও দেওয়া হয়নি। মৃত্যুর পর সৎকারের জন্য তাদের লাশ আত্মীয়স্বজনদের কাছেও ফেরত দেওয়া হয়নি। গাছে ঝুলিয়ে রাখা লাশ পচে বীভৎসরূপ ধারণ করে। লোকে এই বীভৎস দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়। লাশ থেকে মাংস পচে খসে পড়তে থাকে। দুর্গন্ধে ভরে যায় সমস্ত এলাকা। অবেশেষে গাছে ঝুলতে থাকে শুধু কঙ্কাল। এভাবেই সিপাহীযুদ্ধে স্বাধীনতাকামীদের শাস্তি দেওয়া হয়। এমনি নৃশংস ও ভয়াবহ স্মৃতি নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের নির্মম সাক্ষী হয়ে বাহাদুর শাহ্ পার্ক।

লেখক: প্রাবন্ধিক

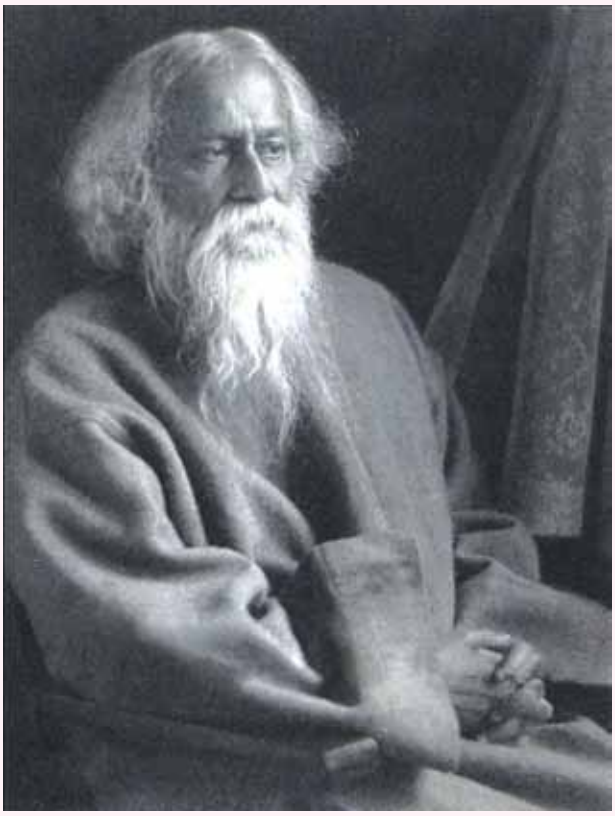

আমাদের ছোট নদী ও রবীন্দ্রনাথের পদ্মাপ্রীতি

ফারিহা রেজা

নদীর নাম 'সোনাই'। যার আরেক নাম গোহালা নদী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অসংখ্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই গোহালা নদীকে ঘিরে। গুমানী নদীর শাখা গোহালা। স্থানীয়ভাবে গুমানীকে কাচিয়া এবং কৈভাঙ্গাঁর নদীও বলা হয়ে থাকে। আরেক নদী 'নাগর'। নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার লোকজন চলনবিলের এই নদীটিকেই 'ছোট নদী' বলে ডাকেন। স্থানীয় লোকজন অবশ্য মনে করেন চলনবিলের নদীই 'নাগরই' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমাদের ছোট নদী। রবি ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত শিশুতোষ কবিতা 'আমাদের ছোট নদী' নওগাঁর পতিসরে বসেই লেখেন। বর্তমানে পতিসর কুঠিবাড়িতে এই কবিতার মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে। বস্তুত অনেককাল আগেই 'নাগর নদের' নাম বদলে গিয়ে হয়ে গেছে 'ছোট নদী'।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো বিল চলনবিল। চলনবিলের কোল ঘেঁষে সিংড়া উপজেলাটি অবস্থিত। ছোট্টবেলার পাঠ্যপুস্তকের সফেদ পাতায় যে কবিতাটি লিপিবদ্ধ ছিল তা আজও আমাদের মনের পর্দায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বোশেখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি
দুইধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি
চিক্ চিক্ করে বালি
কোথা নেই কাদা
একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।

সাদা কাশফুলের হাসির ঝলক, আম, তালের শ্যামল ছায়া, বামন পাড়ায় কলরব, বোশেখ মাসের হাঁটু জল, গরুর গাড়ির পারাপার, নিশুতি রাতে শিয়ালের দলের সম্মিলিত কোরাশ যেন রাতের স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। আজও চোখ বুজে এলে এ দৃশ্য কবিতার পরতে পরতে খুঁজে পাওয়া যায়।

অবশ্য নাগর কিংবা গোহালা নদী, কাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'আমাদের ছোট নদী' কবিতাটি লিখেছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রমথনাথ বিশীর 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' সূত্রে জানা যায়, 'তিনটি বৃহৎ পরগনা নিয়ে ঠাকুর বাবুদের জমিদারি। বিরাহিমপুর, শাহজাদপুর, ও পতিসর। বিরাহিমপুরই ঝিনাইদহ। ঠাকুরবাড়ির জমিদারি ভাগাভাগি হয়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে পতিসর। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর নিলামে এই জমিদারি কেনেন। প্রথমবার ভাগাভাগির পর শাহজাদপুর পড়ল গগেন্দ্রনাথ ভাতৃদ্বয়ের ভাগে। এজমালিতে রইল শিলাইদহ আর পতিসর। ১৯২১ সালের ভাগাভাগিতে রবীন্দ্রনাথ পেলেন পতিসর জমিদারি। এরপর পতিসরে তিনি থিতু হন। শিলাইদহে তাঁর আর যাওয়া হয়নি।'

নদীর মোহনায় যদি স্থায়ী ক্রস ড্যাম দিয়ে বাঁধ দেওয়া হয় তবে নদীর প্রবাহ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। একদিকে গোহালার মোহনায় বাঁধ দেওয়া হয়েছে, আবার মোহনা থেকে আধা কিলোমিটার দূরে পশ্চিমে গোহালাকে কেটে বড়াল নদীর সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়নি। গোহালার বাঁধ দেওয়া স্থানের নাম রাউতারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুবার শিলাইদহ থেকে অনেকবার পদ্মা পাড়ি দিয়ে ইছামতি নদী দিয়ে শাহজাদপুর এসেছেন। কখনো বড়ালের স্রোতে বজরা ভাসিয়েও শাহজাদপুরে এসেছেন। শাহজাদপুর থেকে পতিসরে গেছেন চলনবিলের পথ ধরে। চলনবিলের মানুষেরা রবীন্দ্রনাথ যে নদী দিয়ে জমিদারি দেখভাল করার জন্য যাতায়াত করতেন সে নদীগুলোকে 'ছোট নদী' ভাবতে ভালোবাসে। 'ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া' থেকে জানা যায়, চলনবিল অঞ্চলে এক হাজার ৭৫৭ হেক্টর আয়তনের ৩৯টি বিল রয়েছে। ২৮৬ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট নদী রয়েছে ১৬টি, ১২০ বর্গকিলো আয়তন বিশিষ্ট ২২টি খালও রয়েছে চলনবিলে। প্রধান নদীগুলো– মুসা খাঁ, নারদ, নাগর, আত্রাই, গুড়, করতোয়া, বড়াল, তুলসী, ভাদাই, গদাই, খলশীভাঙা, চিকনাই বারনই, বুড়া, চন্দনা, গুমানী, নন্দকুজা। প্রধান খালগুলো– নবীর হাজার জোলা, হক সাহেবের খাল, নিমাইচরা বেশানী খাল, বেশানি ওমানী খাল, উলিপুর সাঙ্গুঁয়া খাল, দোবিলা খাল, কিশোরখালি খাল, বেবুলার খাড়া, বাঁকাই খাড়া, লোহালা খাল, গাড়াবাড়ি দারুখালি খাল, বিলসূর্য খাল, কুমার ডাঙ্গাঁ খাল, জানি গাছার জোলা, সাত্তার সাহেবের খাল, কিনু সরকারের ধর ও পানাউল্লা খাল। চলনবিলের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি ছোটো ছোটো বিল। এগুলো হলো– হালতি বিল, বড়ো কিল, খলিশাগাড়ি বিল, ধনাইর বিল, ছয়আনি বিল, বাইডার বিল, ষাধুগাড়ি বিল ও মহিষা হালট বিল।

ছিন্নপত্রাবলির পাঠকমাত্রই জানেন রবীন্দ্রনাথের পদ্মাপ্রীতির কথা। যাতায়াত অঞ্চলের নদনদী, জনজীবনের বিবরণে পদ্মা প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল। এটি শিলাইদহের নদী। শাহজাদপুর পরগণায় গাঁ ঘেষে পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বক্ষপুত্র যা বর্তমানে যমুনা নামে পরিচিত। আত্রাই নদী দিনাজপুর, বগুড়া হয়ে রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করেছে, উত্তর দিক থেকে এসেছে নাগার নদ। দুটোই এসে মিলিত হয়েছে চলনবিলে। চলনবিলের খালগুলোর মুখে চর পড়ে

যাওয়ায় পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। খালগুলো দখল-দূষণে আক্রান্ত। ফলে বিপন্ন হয়ে পড়েছে চলনবিলের নদনদীর অস্তিত্ব।

রবীন্দ্রনাথ নৌকাবাস কতখানি ভালোবাসতেন তা তাঁর বর্ণনার থেকে জানা যায়। ১৯৩৭ সালে শেষবারের মতো তিনি পতিসরে আসেন। কলকাতা থেকে ট্রেনে করে এসে আত্রাই রেল স্টেশনে নামতেন। নৌকাযোগে যেতেন ৬ মাইল পথ। অতঃপর পতিসর কুঠিবাড়ি। কখনো কলকাতা থেকে রেল যোগে কুষ্টিয়া এসে ৭ মাইল পথ পালকিতে চড়ে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি আসতেন। পদ্মা নদীর পাশেই শিলাইদহ কুঠি। একসময় কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী জেলা ছিল নদীমার্তৃক। নৌকা ছিল অন্যতম বাহন। সেসময় শিলাইদহ কুঠিবাড়ি থেকে পতিসর কুঠিবাড়ি তিন দিনের পথ। কবি পালকি থেকে নৌকাবাসে যাত্রা অধিকতর পছন্দ করতেন।

ছিন্নপত্রের এক চিঠিতে কবি লেখেন– 'অনেকদিন পর আমার নির্জন বোটটির মধ্যে এসে ভারী আরাম বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরছি।'

জমিদারি দেখভালের জন্য কবি নৌকা যোগে বিভিন্ন জায়গা ঘুরেছেন। কিন্তু শিলাইদহের বালুচর আর পদ্মার কথা স্মরণে কবি লিখেছেন– 'পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমন পদ্মা।'

নৌপথে রবীন্দ্রনাথের প্রধান গতিবিধি ছিল– পদ্মা, যমুনা, ইছামতি, বড়াল, গুমানী, হুড়াসাগর, আত্রেয়ী, বালেশ্বরী এবং করতোয়া। এছাড়াও রাজশাহী বিভাগের অনেক শাখা নদী ও উপনদীতে কবির যাতায়াত ছিল। জমিদারি দেখাশুনার জন্য নদীপথে কবির যাতায়াত ছিল উল্লেখ করার মতো। পানসি, লালডিঙ্গি, জালিবোট প্রকৃতি বিচিত্র রকমের নৌকা হামেশাই ঘাটে বাঁধা থাকত। নদীপথে চলাচলের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের দুটো বড়ো ঢাকাই বজরা (বড়ো নৌকা) ছিল। পদ্মাকে কবি বড়ো ভালোবাসতেন। তাই পদ্মা নদীর নামের সঙ্গে মিল রেখে বজরা দুটির নাম রেখেছিলেন 'পদ্মা' ও 'পদ্মাবোট'। অধিকাংশ রবীন্দ্র গবেষক দাবি করছেন এই পদ্মা বোটেই কবি *চৈতালী* ও *ছিন্নপত্রের* অধিকাংশ লেখা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ছিন্নপত্র'। গ্রন্থটি ১৫৩ পত্রের সংকলন। এর মধ্যে ১৪৫টি পত্র তাঁর ভাইজি ইন্দ্রিরা দেবীকে লেখা। *ছিন্নপত্রে* রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করা যায় নতুন মাত্রায়। তিনি একটানা দশবছর বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, পাবনা ও নওগাঁয় বসবাস করেছেন। বাংলাদেশের উদার প্রকৃতি কবির মনে যে ভাবাবেগের সূচনা করেছে তা পরবর্তীতে তাঁর লেখনিতে সুস্পষ্ট ছাপ ফেলেছে। বাংলার প্রকৃতি, এদেশের নদীঘেঁষা জনপদ আর নৌকাবাস একাকার হয়ে মিশে আছে।

'যোগাযোগ' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের কথা উল্লেখ করার মতো। সেসময় বাহন হিসেবে নৌকার বিকল্প ছিল না। আগেই উল্লেখ করেছি কবি নৌকাবাস ভালোবাসতেন। জমিদারি দেখভালের জন্য বিরাহিমপুরে বা শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসরে প্রায় সময় আসা-যাওয়া করতে হতো তাঁকে। যদিও ১৯২১ সালের জমিদারি বাড়ি ভাগাভাগি হলে রবীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে পতিসর, তখন থেকে রবীন্দ্রনাথ আর শিলাইদহে যাননি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে গোহালা, বাউতারা ও পাথর ইত্যাদি স্থানের সঙ্গে।

চলনবিল নিয়ে কবি খুব একটা উচ্চাশা পোষণ করেননি। পথযাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক চিঠিতে কবি লেখেন–

> একটা মস্ত বিল আছে, তার নাম চলনবিল। ঠেলে ঠুলে অনেক কষ্টে এবং অনেক বিপদ এড়িয়ে বিলের মধ্যে এসে পড়লুম। এই বিলটি আমার ভালো লাগেনি। তারপর মাঝে মধ্যে ছোটো ছোটো নদী, মাঝে মাঝে বিল এমনি করে এসে পৌঁছেছি। এখানকার নদীতে একেবারে স্রোত নেই। শ্যাওলা ভাসছে। মাঝে মাঝে জঙ্গল হয়েছে। পাড়াগাঁয়ে পুকুরের যে একরকম গন্ধ পাওয়া যায় সেই রকম গন্ধ। তাছাড়া রাত্রিতে বোধ হয় মশা পাওয়া যাবে। নিতান্ত অসহ্য হলে এইখান থেকেই কলকাতায় পালাব।

১৯২২ সালে কবি শেষবারের মতো শিলাইদহে আসেন। পদ্মা নদী দেখে তিনি হতাশ হন। তিনি লেখেন, 'আগে পদ্মা কাছে ছিল। এখন নদী সরে গেছে। আমার তেতলা ঘরের জানালা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করতে পারি।'

১৮৯১ সালে প্রথমবারের মতো নৌকাযোগে কবি নওগাঁর নাগর নদীর তীরে অবস্থিত পতিসর কুঠিবাড়িতে যান। শিলাইদহ থেকে পতিসরে যেতে ছোটো ছোটো নদী পড়ত। *চৈতালীর* সূচনায় কবি লেখেন– 'পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য অল্প তার পরিসর। মন্থর তার স্রোত। কোনো এক গ্রীষ্মকালে এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। শিলাইদহ থেকে পতিসরে যেতে আর একটি ছোটো নদী পড়ত। নাম তার ইছামতি।' কবি লেখেন–

> আঁকাবাঁকা ইছামতি নদীর ভিতর দিয়ে চলেছি, এইযে দুইধারে সবুজ ঢালু ঘাট,দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত, আখের ক্ষেত আর সারি সারি গ্রাম– এ যেন একই কবিতার কয়েকটি লাইন। আমি বার বার আবৃতি করি এবং তা বার বারই ভালো লাগছে। পদ্মা এত বড়ো নদী, সে যেন ঠিক মুখস্ত নেয়া যায় না আর কেবল কয়টি বর্ষা মাসের দ্বারা অক্ষর গোনা ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে।

কবি আরো লেখেন– 'কেবল একটি ছোটো নদী আছে। যেন সে কেবল এই কয়খানি গ্রামেরই ঘরের ছেলেমেয়েদের নদী। অন্য কোনো বৃহৎ নদী, সুদূর সমুদ্র অপরিচিত গ্রাম নগরের সহিত যে

তার কণ্ঠ

রুহুল গনি জ্যোতি

(আবৃত্তিকার কাজী আরিফ স্মরণে)

জলদগম্ভীর ভরাট কণ্ঠ তার অবিরাম ঝরত একদিন
বাংলার মাঠঘাট পথে প্রান্তরে অবাধে ছড়িয়ে যেত প্রতিটি উচ্চারণ
সে এক মায়াবী জাদুকর বাঁশিওয়ালা যেন সে বিরহী শ্যাম
অনন্ত প্রতীক্ষারত।
আমার শৈশব-তারুণ্য-যৌবন ঘিরে একদিন
কেবলই ছড়িয়ে গেছে কবিতার মায়াবী আলো
কখনো চাঁদনী রাতে, বিষণ্ন বিকেলে
কখনো তুমুল উল্লাসের দিনে, কখনো বিপন্নতায়
প্রবল ঝড়ো হাওয়ায় সেই কণ্ঠের কাছে হয়েছি সমর্পিত
কবিতায় বুদ হয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নতার ঘোরে কত যে গিয়েছি ডুবে
মায়াবী সেই কণ্ঠ ঘিরে কত যে স্মৃতি মেদুর দিন
হৃদয়ের পরতে পরতে আবেগের নকশিকাঁথায় সে আছে ছড়িয়ে
আজো কবিতাকে ভালোবেসে যতই গভীরে যেতে চাই
ততই সেই কণ্ঠের সঙ্গে মমতার বন্ধনে জড়িয়ে যাই
তার কণ্ঠে ঝরে পড়া বর্ণিল কবিতাগুলো
সহসাই জীবন্ত হয়ে আনন্দ হিল্লোলে ঢেউ তুলে নাচত যেন
দুর্নিবার কী যে এক আকর্ষণে টানত কেবলই
বাংলার অসংখ্য অঝর কবিতায় তার স্মৃতি
তার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত প্রতিটি অক্ষর বিস্ময়ে শিহরণ জাগাবে বহুকাল
পদ্মা মেঘনা যমুনা ধলেশ্বরীতে অবিরাম ঢেউ তুলে যাবে তারা
কখনো দারুণ আক্রোশে দ্রোহের আগুন ঝরাবে
তার কণ্ঠে কবিতা প্রেমিরা খুঁজে পাবে পথ
বাংলার বিমুখ প্রান্তরে।

তাহার যাতায়াত আছে তাহা এখানকার গ্রামের লোকেরা যেন জানিতে পারে নাই। তাই তাহারা অত্যন্ত সুমিষ্ট একটা আদরের নাম দিয়ে উহাকে নিতান্ত আত্মীয় করিয়া লইয়াছে।'

কোন নদী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিশুতোষ কবিতা 'আমাদের ছোট নদী' লিখেছেন– 'সেই নদীর উৎপত্তি স্থল কোনটি এর পতিত মুখই বা কোন নদীর বুকে।' ১৮৯১ সালে কবি সর্বপ্রথম যখন নওগাঁর নাগর নদীর তীরে অবস্থিত পতিসর কুঠিবাড়িতে আসেন, তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে/বোশেখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।' তবে চিক চিক করা বালিতে যখন এঁকে বেঁকে নদী বয়ে যাচ্ছিল তখন কবির মনে এই জাতীয় শিশুতোষ কবিতার ভাব উদয় হওয়া বিচিত্র নয় বলে অনেক নদী প্রেমিকই মনে করছেন।

পদ্মা নদী কবির জীবনের অনেকটাই প্রভাব ফেলেছে। কবি লেখেন–'আমার যৌবন ও পৌঢ় বয়সের সাহিত্য রস সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা প্রবাহ চুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে'। জমিদারি দেখভালের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপাড়ের জীবনকে নিজের মধ্যে একান্ত করে নিয়েছেন। এখানকার দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনাকে নিজের করে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে পদ্মাপাড়ের কৃষকদের দুঃখ-কষ্টে কবির অন্তর বেদনার্ত হয়ে উঠত। বৃষ্টির পানিতে নৌকা বোঝাই করে কৃষকরা যখন তাদের আগাম বর্ষা বা স্রোতের ঢলের জন্য কাঁচা ধান কেটে নিয়ে যায় তখন তাদের দুঃখে কবি মন কেঁদে উঠে। রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস ও কবিতায় পদ্মাপাড়ের প্রান্তিক খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের জীবনচিত্র প্রতিভাত হয়েছে নানাভাবে। তাই পদ্মাপাড়ের জীবনবোধ কবিকে ভিন্ন স্বতন্ত্র দিয়েছে তার লেখনিতে। পদ্মাকে কেন্দ্র করে তার বেশ কিছু বিস্ময় জাগানিয়া লেখা পাঠক মহলকে চিন্তার খোরাক জোগায়। শিলাইদহে এক জুনে (১৮৯৪) তিনি বলেছেন, যাদের কথা লিখার তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একবারে ভরে রেখে দেবে। আমার একলা মনের সঙ্গী হবে। বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে। রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পড়ে ঘুরিয়ে বেড়াবে। শাহজাদপুর বসেও রবীন্দ্রনাথ ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪-তে একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন–

> এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের বিশেষ করে কাকের ডাক এবং সুদীর্ঘ সুন্দর অবসর আমারে ভারী উদাস এবং আকুল করে। আমার এই শাহজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা।

পদ্মাতীরের মোহনীয় নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি কবিকে আপ্লুত করেছে। শিলাইদহের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এক চিঠিতে লেখেন–' বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল-তল, থৈ-থৈ করছে। নদীর জল এবং নদীর তীর প্রায় সমতল, ধানের ক্ষেত সুন্দর সবুজ গ্রামের গাছপালা সতেজ এবং নিবিড় হয়ে উঠেছে। এমন সুন্দর লাগল সে আর কী বলব। বিকেলে পদ্মার ধারে নারিকেল বনের মধ্যে সূর্যাস্ত হলো। দূরে। আম বাগানে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে আসছে। নারকেল গাছগুলোর পিছনে আকাশ সোনায় সোনালি হয়ে উঠছে। পৃথিবীতে কি আশ্চর্য সুন্দরি তা এইখানে না এলে মনে হতো না। নৌকাবাসে জালিবোটে যখন তিনি মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন– 'হয়ত আর কোন জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর কখনো ফিরে আসবে না। সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশ পাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। তাইতো রবীন্দ্রনাথ পদ্মাকে 'প্রেয়সী' হিসেবে উল্লেখ করতে পেরেছেন। তরুণ বয়স থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পদ্মায় নিমগ্ন ছিলেন। ১৮৯৩ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল এই দীর্ঘসময় তিনি পুরী, কটক, কলকাতা হয়ে শিলাইদহে যখন যান, পদ্মার ভালোবাসায় নিমগ্ন হয়ে এক পত্রে লেখেন– 'এখন আমি বোটে। এ যেন আমার নিজের বাড়ি। এখন দিনকতক আমার এই পূর্ব পরিচিতের সঙ্গে পুনর্মিলনের নতুন বাধো বাধো ভাবটা কাটাতেই হবে। এরপর নিয়মিত নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের পুরাতন সখ্য বেশ সহজ হয়ে আসবে। রবীন্দ্রনাথ 'পদ্মা' কবিতায় লেখেন– 'গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান তোমারে সপেছিনু আমার পরান। সে দিনের পর হতে, হে পদ্মা আমার তোমার দেখা শত শতবার'।

লেখক: ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কলকাতার বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য প্রতিস্থাপন

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সরকারি বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকক্ষে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নতুন একটি আবক্ষ ভাস্কর্য প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ৩রা আগস্ট এই ভাস্কর্যের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সিভিল ডিফেন্স দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান এবং কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনার তৌফিক হাসানসহ কলকাতার বিশিষ্টজনেরা।

এর আগে এই বেকার হোস্টেলে ২০১১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রথম বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মুখমণ্ডল যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি কলকাতার ভাস্কর। এ নিয়ে পরবর্তীতে বারবার আপত্তি ওঠার পর এবার সেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত অবয়ব ফুটিয়ে তুলে নতুন একটি ভাস্কর্য স্থাপনের উদ্যোগ নেন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম।

এ উপলক্ষে ৩রা আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নতুন একটি ভাস্কর্য ঢাকা থেকে এনে তা স্থাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর নতুন এই ভাস্কর্যটি তৈরি করেছেন ঢাকার শিল্পী লিটন পাল রনি। ঐতিহ্যবাহী বেকার হোস্টেলটির অবস্থান কলকাতার শিয়ালদহের কাছে ৮ স্মিথ লেনে। এই ভাস্কর্য উন্মোচন করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সারা বিশ্বের বাঙালিদের গর্ব। তাঁর নাম আজ ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে। জাতির পিতার নেতৃত্বেই বিশ্ব পেয়েছে বাঙালিদের একটি পৃথক আবাস ভূমি। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে ভারতের এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আমাদের এই সম্পর্ক আরো দৃঢ় হলো কলকাতার বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবাহী বেকার হোস্টেলে এই ভাস্কর্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। ১৯১০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এই বেকার হোস্টেলটি। ১৯৪৬ সালে বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই ইসলামিয়া কলেজ থেকে স্নাতক পাস করেছিলেন। ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বেকার হোস্টেলের ২৩ ও ২৪ নম্বর কক্ষ নিয়ে গড়া হয় 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কক্ষ'। এই স্মৃতি কক্ষে এখনো রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত খাট, চেয়ার, টেবিল এবং আলমারি। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ২৪ নম্বরের পাশের ২৩ নম্বর কক্ষটিকে যুক্ত করে স্মৃতিকক্ষ গড়ার উদ্যোগ নেন। সেই হিসেবে ১৯৯৮ সালের ৩১শে জুলাই বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কক্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী।

প্রতিবেদন: তানজিনা বেগম

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি

সাহিদা বেগম

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে একটি সুরক্ষিত সেলে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও ৩৪ জন দেশপ্রেমিক বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল পাকিস্তান সরকার সেই ষড়যন্ত্র মামলার শুনানির আরম্ভের দিন ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিভিন্ন কারণে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই বিদ্রোহের মামলা থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধে এবং ১৯৬৯ সালে অবিস্মরণীয় গণঅভ্যুত্থান ঘটে। এর পরেই ১৯৭০-এ তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার দেশে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। এই মামলার সূত্র ধরে আওয়ামী লীগকে এক অভূতপূর্ব বিজয়ের পথেই শুধু নিয়ে যায়নি বরং সকল শ্রেণির রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় মানুষকে একটি চূড়ান্ত লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

১৯৬৬ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা আন্দোলন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন।

পশ্চিমা শাসকদের শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে মুক্তির একমাত্র সনদ তখন বাঙালির সামনে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি। এই ৬ দফাতে ছিল পাকিস্তানের সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবি। আছে শোষণ আর বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশনা। আর আছে বাঙালির অধিকারের কথা। তদানীন্তন সরকারের কাছে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের একমাত্র দাবি ৬ দফার আলোকে পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র গঠন করতে হবে। বাঙালির প্রাণের দাবি হয়ে উঠল ৬ দফা। শেখ মুজিব বাঙালির ত্রাণকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। পাকিস্তান সরকার তথা পশ্চিমা অবাঙালি শাসকরা শঙ্কিত হলো। শুরু হলো শেখ মুজিবের ওপর জেল, জুলুম, নির্যাতন। তবু স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবকে দাবিয়ে রাখা গেল না। শেখ মুজিব তাঁর ৬ দফা কর্মসূচি নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে এগিয়ে চললেন বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে।

অন্যদিকে, পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর কিছু সংখ্যক বাঙালি অফিসার ও সৈন্য সশস্ত্রবাহিনীর ভেতর বিরাজমান বৈষম্যের কারণে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হতে থাকে। এই ক্ষুব্ধ অফিসার ও সেনারা অতি গোপনে বাঙালির স্বার্থ রক্ষায় সংগঠিত হতে থাকেন। পশ্চিমাদের সাথে থেকে বাঙালির স্বার্থ রক্ষা কখনো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে এই সেনা সংগঠনটি একটি লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, আর তা হচ্ছে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করে ফেলা। এই গোপনীয়তায় তারা কাজ করে যেতে থাকেন। তাঁদের এই কর্মসূচির প্রতি বাঙালির জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা এবং বিদ্রোহীদের গোপন সংগঠনের দুজন সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহের কথা সরকারের গোচরে চলে যায়। শুরু হয় সরকারের গ্রেফতারি তৎপরতা। সারা পাকিস্তান তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেড় হাজার দেশপ্রেমিক বাঙালিকে আইয়ুব সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী গ্রেফতার করে।

এরপর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি এক প্রেসনোটে ঘোষণা করে যে, তারা ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি এক চক্রান্ত উদঘাটন করেছে। এই ঘোষণায় ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনের গ্রেফতারের খবর প্রকাশ পায়। এতে অভিযোগ করা হয় যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা ভারতীয় সহায়তায় এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র দফতর এরপর ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি অপর এক ঘোষণায় অভিযোগ করে যে, শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব শামসুর রহমান সিএসপি (সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের ভ্রাতা) সহ চক্রান্তে লিপ্ত আছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রেসনোট

শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা

ইসলামাবাদ, ১৮ই জানুয়ারি (এ.পি.পি): আজ এখানে স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীর বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ) দফতর থেকে নিম্নলিখিত প্রেসনোট জারি করা হয়েছে–

আগরতলা ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত যে ২৮ জনের নাম ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের এযাবতকাল পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটক রাখা হয়েছিল। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর আইনবলে তাদের ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণ তারা এসব আইনের আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধ করেছেন। এই ব্যাপারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই অন্যান্যদের সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তিনি পূর্ব থেকেই জেলে ছিলেন।

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভায় 'আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ শেখ মুজিবের প্রকাশ্যে বিচার দাবি।'

আগরতলা ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানপূর্বক প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা এবং তাঁহার অবস্থানের কথা প্রেসনোট আকারে

প্রকাশের জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং ৬ দফা কর্মসূচি ও জনগণের অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে তাহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখিবে। প্রস্তাবে দৃঢ়তার সহিত বলা হয় যে, ৬ দফার বাস্তবায়নই দেশের সত্যিকার অখণ্ডতা ও বৃহত্তর সংহতি রক্ষার একমাত্র ভিত্তি বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।

দৈনিক পাকিস্তান
১৮ই জানুয়ারি, ১৯৬৮

এরপর দেশ রক্ষা আইনে ১৯৬৬ সালের ৯ই মে থেকে আটক শেখ মুজিব ও গ্রেফতারকৃত অন্যান্য ব্যক্তিদের জেল গেটে মুক্তি দিয়ে আবার সেনাবাহিনী, নৌবহিনী ও বিমানবাহিনী আইনে তাদের আটক করা হয়। এই অবস্থায় তাদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সামরিক হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল করবে, কিন্তু পরবর্তী চিন্তায় পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সালের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক উচ্চপদস্থ বাঙালি অফিসারদের এই অভিযোগে জড়িত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তারা সাজিয়ে তোলে।

মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয় আদালতে। অভিযুক্তদের মধ্যে ৩ জন সিএসপি অফিসার, ৩ জন সাধারণ নাগরিক, ১ জন রাজনীতিবিদ এবং তিনি জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ২৮ জন সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য। ৩৫ জন অভিযুক্তের নাম:

শেখ মুজিবুর রহমান–১নং, লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন–২নং, স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান–৩নং, এস.এস.সুলতান উদ্দিন আহমেদ–৪নং, নূর মোহাম্মদ–৫নং, আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি–৬নং, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ–৭নং, এ.বি.এম আ. ছামাদ–৮নং, হাবিলদার দলিল উদ্দিন হাওলাদার–৯নং, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি–১০নং, ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক–১১নং, ভূপতি ভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী)–১২নং, বিধান কৃষ্ণ সেন–১৩নং, সুবেদার আ. রাজ্জাক–১৪নং, হাবিলদার মুজিবুর রহমান–১৫নং, ফ্লাইট সার্জেন্ট আ. রাজ্জাক–১৬নং, সার্জেন্ট জহরুল হক–১৭নং, এ, বি, মো. খুরশীদ–১৮নং, খান এম, শামসুর রহমান সিএসপি–১৯নং, রিসালদার এ, কে, এম, শামসুল হক–২০নং, হাবিলদার আজিজুল হক–২১নং, মাহফুজুল বারী–২২নং, সার্জেন্ট শামসুল হক–২৩নং, কর্নেল শামসুল আলম–২৪নং, মেজর মোঃ আ. মোতালেব–২৫নং, কর্নেল এম. শওকত আলী–২৬নং, কর্নেল খোন্দকার নাজমুল হুদা–২৭নং, ব্রিগেডিয়ার এ,এন,এম, নুরুজ্জামান–২৮নং, ফ্লাইট সার্জেন্ট (অব.) আ. জলিল–২৯নং, মো. মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী–৩০নং, লে. এম,এম,এম, রহমান–৩১নং, সুবেদার এ,কে,এম, তাজুল ইসলাম–৩২নং, মো. আলী রেজা–৩৩নং, ব্রিগেডিয়ার খুরশীদ উদ্দিন আহম্মেদ–৩৪নং ও কমান্ডার আবদুর রউফ–৩৫ নম্বর।

সামরিক আইন প্রশাসক, পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় চেপে বসা আইয়ুব খানকে তার পরামর্শদাতারা এই ধারণা দিতে সক্ষম হন যে, উনসত্তর সালের প্রথম ভাগের মধ্যে বিশেষ আইনে সামরিক ও বেসামরিক যৌথ উদ্যোগে পূর্ব বাংলায় সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং ভারতের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে সংশ্লিষ্টদের বিচার করে রায় প্রদান করলে সে রায়ের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক উত্থান স্তব্ধ করা যাবে। শেখ মুজিবসহ অনেকের ফাঁসির দণ্ডাদেশ বা অনেকের দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হলে ষাটের দশকের ৬ দফাসহ অন্যান্য আন্দোলন কঠোরভাবে দমন হতে বাধ্য। ফলে সত্তর সালের নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচন আইয়ুব খান ও তার কনভেনশন বা মুসলিম লীগের বিজয় হবে সুনিশ্চিত।

পাকিস্তান পেনাল কোডের সংশোধনী এনে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন ৩৫ জনকে আসামি করে এবং দু'শয়েরও অধিক সরকার পক্ষের সাক্ষীর তালিকা নিয়ে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১-ক ধারা এবং ১৩১ ধারা মতে মামলার শুনানি শুরু হয়। মামলায় শেখ মুজিবকে ১ নম্বর আসামি করা হয় এবং 'রাষ্ট্র বনাব শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' এই শিরোনামে মামলাটি দায়ের করা হয়। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে একটি সুরক্ষিত সেনা ছাউনিতে গঠন করা হয় বিচারের এই বিশেষ আদালত বা ট্রাইবুনাল। ছোটো বিচারকক্ষ। কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সরিয়ে বন্দিদের তখন ক্যান্টনমেন্টের ভেতর সামরিক হেফাজতে রাখা হয়েছিল।

তিন সদস্যবিশিষ্ট ট্রাইবুনালে প্রধান বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি এস, এ, রহমান। তিনি ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং অবাঙালি। অন্য দুজন ছিলেন বাঙালি এবং পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি এম. আর. খান, অপরজন বিচারপতি মুকসুমুল হাকিম।

মোট ১০০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয় আদালতে। সরকার পক্ষে মামলায় ১১ জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২১৭ জন সাক্ষীর তালিকা আদালতে পেশ করা হয়।

১৯৬৮ সালের ৫ই আগস্ট ব্রিটিশ আইনজীবী মিস্টার টমাস উইলিয়াম শেখ মুজিবের পক্ষে ট্রাইবুনাল গঠন সংক্রান্ত বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন পেশ করেন। তিনি আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন, খান বাহাদুর ইসমাইল, জহির উদ্দিন, তরুণ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ও অন্যান্য আইনজীবীদের সাথে একত্রে বিবাদি পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

মামলা শুরুর আগে অভিযুক্তদের কয়েকজন যেমন ২নং অভিযুক্ত কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, সার্জেন্ট জহিরুল হক, এ বি খুরশিদসহ আরো কজন অভিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ট্রাইবুনালে তারা মামলায় আনা অভিযোগের দায় স্বীকার করবেন। বলবেন, তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা চান এবং সেই লক্ষ্যে তাঁদের এই প্রচেষ্টা। পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা তাদের বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগ মিথ্যা নয়, সত্য। কিন্তু অভিযুক্ত পক্ষের প্রধান কৌশলী জনাব আবদুস সালাম খান পরামর্শ দেন যে, এ অভিযোগ স্বীকার করলে অভিযুক্তদের ফাঁসি ঠেকানো যাবে না এবং মামলায় তাঁদের হার হবে। তখন শেখ মুজিবের নির্দেশ ও পরামর্শে উক্ত অভিযুক্তরা আইনজীবীদের পরামর্শ মোতাবেক বক্তব্য দেওয়ায় সম্মত হন।

সরকার পক্ষে প্রধান কৌসুলি ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মঞ্জুর কাদের ও বাঙালি অ্যাডভোকেট জেনারেল জনাব টিএইচ খান। মামলা চলাকালীন দেশের সংবাদপত্রগুলোতে মামলার প্রতিদিনের কার্যবিবরণী প্রকাশের সময়ে সরকারি নির্দেশে মামলাটির শিরোনামে ছাপা হতে থাকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। মামলার এই শিরোনাম পরিবর্তনের পেছনে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নাম দিয়ে শেখ মুজিবকে দেশের জনগণের কাছে ভারতীয় ষড়যন্ত্রকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে শেখ মুজিবের ফাঁসি ত্বরান্বিত করা সরকারের পক্ষে সহজ হবে এবং জনসমর্থন সরকারের পক্ষে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আইয়ুব সরকারের। সরকারের নিক্ষিপ্ত তীর বুমেরাং হয়ে সরকারের বিরুদ্ধেই এসে আঘাত করে।

সরকারি সাক্ষীরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সরকারের বিপক্ষেই বিষোদগার করতে থাকেন। তাঁরা তাদের উপর সরকারের নির্যাতনের কাহিনি করুণ ভাষায় বর্ণনা করতে থাকেন। সেসব বর্ণনা পরদিন দেশের সংবাদপত্রগুলোতে ফলাও করে প্রকাশ হতে থাকে। সাক্ষীরা বলেছিলেন, সরকার নির্যাতন করে তাদেরকে এই মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিতে বাধ্য করেছে, অথচ এই মামলা সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না। ফলে দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় সরকারই এই ষড়যন্ত্রের হোতা। এই সময় শেখ মুজিবের অনুরোধে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সরকারি এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভা করেন এবং রাজপথে উত্তপ্ত বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। রাজপথে তখন বাঙালির দাবি হলো– প্রহসনমূলক ষড়যন্ত্র মামলা মানি না, মানব না! রাজপথে মিছিলের স্লোগান হলো:

কুর্মিটোলা ভাঙ্গো, শেখ মুজিবকে আনবো।
কুর্মিটোলা ঘেরাও কর, শেখ মুজিবকে মুক্ত কর।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে তদানীন্তন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের উভয় অংশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ট্রাইবুনালের তিনজন বিচারকের মধ্যে দুজনই ছিলেন বাঙালি। রাজপথের এই গণদাবির মুখে বিচারকেরাও দোদুল্যমানতায় জড়িয়ে পড়েন। সরকার বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আইয়ুব শাহী বুঝতে পারে গণদাবির বিরুদ্ধে গিয়ে ট্রাইবুনালের রায় ঘোষণা করে অভিযুক্তদের ফাঁসি দিলে বা যে-কোনো দণ্ড প্রদান করলে তা পাকিস্তানের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে। সুতরাং মামলার রায় ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। রায় ঘোষণার আগেই অন্য উপায়ে শেখ মুজিবকে হত্যা করতে হবে।

আসামিদের ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছিল। শেখ মুজিবকে অন্য তেরো জনের সঙ্গে বন্দি রাখা হয়েছিল ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল অফিসার্স মেসে। তাঁকে সেখানেই হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ক্যাম্পাসের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিন অভিযুক্তদের প্রহরাধীন অবস্থায় কিছু সময় হাঁটানো হতো। গুপ্তঘাতককে শেখ মুজিব সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়, দীর্ঘদেহী, গোঁফওয়ালা লোকটি শেখ মুজিব। রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন হাঁটার সময়ে এই দীর্ঘদেহী শেখ মুজিবকে গুলি করে হত্যা করতে হবে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ শেখ মুজিব প্রহরাধীন অবস্থায় পায়চারি করছিলেন। শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণ ক্ষমতা ছিল এমন অত্যাশ্চর্য যে, অবাঙালি পাঠানও ছিল তার ভক্ত। সেদিন হত্যার এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা একজন পাঠান ক্যাপটেন এসে ত্বরিতগতিতে তাঁকে জানিয়ে চলে যান এবং শেখ মুজিবকে দ্রুত তাঁর কক্ষে চলে যেতে বলেন। শেখ মুজিব দ্রুত নিজ কক্ষে চলে আসেন। খবরটি অতিদ্রুত বন্দিশালায় ছড়িয়ে পড়লে সে রাতে আর কিছু ঘটেনি।

কিন্তু চরম নৃশংসতা ঘটে পরদিন ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভোর সাড়ে ছ'টার দিকে। শেখ মুজিবের বন্দি এলাকা থেকে একটু দূরে থার্ড পাঞ্জাব রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টারে বন্দি ছিলেন অপর বাইশজন অভিযুক্ত। ভোরে গার্ডের অনুমতি নিয়ে মামলার ১৭ নম্বর অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহরুল হক ও ১১ নম্বর অভিযুক্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক তাঁদের নির্দিষ্ট কক্ষের বাইরে টয়লেটে যাবার জন্যে বের হন। সার্জেন্ট জহরুল হকের ছিল দীর্ঘ দেহ আর মোটা গোঁফ। দেখতে অনেকটা শেখ মুজিবের মতো। মাত্র ছ' থেকে আট ফুট দূর থেকে গুপ্তঘাতক মুখোমুখী গুলি করতে শুরু করে। এই দুজনের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বেয়নেট চার্জ করা হয় তাদের। সিএমএইচ হাসপাতালে অপারেশনের পর ফজলুল হক বেঁচে যান কিন্তু সার্জেন্ট জহরুল হক মৃত্যুবরণ করেন।

এই হত্যাকাণ্ডের খবর বাইরে প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ বাঙালি ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা অন্যান্য ভবনের সাথে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনেও আগুন দেয়। ফলে মামলার নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়। আর যে ভবনে বাস করতেন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান এস এ রহমান এবং সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের আক্রমণের মুখে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যান। শোনা গেছে এস, এ, রহমান লুঙ্গি পড়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে সোজা বিমানবন্দরে চলে যান।

জ্বালাও, পোড়াও, ঘেরাও আন্দোলনে ঢাকা তথা সারা পূর্ব বাংলা এক অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়। ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনকে জনতা নিয়ে যায় চরম পরিণতির দিকে, রূপ নেয় গণ-অভ্যুত্থানে। এই আন্দোলনের মুখেই শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকারকে নতি স্বীকার করে ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে হয় এবং শেখ মুজিবসহ সকল বন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়।

পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি দশ লাখ বাঙালির এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের এক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই সভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ এই উপাধিকে সমর্থন করেন।

তার পরবর্তী ইতিহাস ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন।

লেখক: অ্যাডভোকেট ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা

প্রথম ডিজিটাল নগর

'ডিজিটাল সিলেট সিটি' নামে পাইলট প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে সিলেট ডিজিটাল নগর হচ্ছে, যা সফল হলে ধীরে ধীরে দেশের অন্যান্য নগরকেও গড়ে তোলা হবে এভাবে। এই ডিজিটাল সিলেট সিটি'র উদ্‌বোধন হয় ২৮শে জুলাই।

'ডিজিটাল সিটি' প্রকল্পে নগরের ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে সবার আগে নাগরিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নগরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোর নজরদারিতে বসানো হচ্ছে চেহারা ও যানবাহনের নাম্বার প্লেট চিহ্নিত করতে সক্ষম আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) ক্যামেরা।

বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই জোন তৈরি করা হবে। এসব জোনে ১২৬টি ওয়াই-ফাই এক্সেস পয়েন্ট (এপি) থাকবে। বিনামূল্যের এ ইন্টারনেট সেবা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

সিলেট নগরের ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অটোমেশন ব্যবহার করা হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পারফরম্যান্স ও সবার নৈমিত্তিক কার্যক্রম অনলাইনেই জানা যাবে সিলেট নগরে সরকারি হাসপাতালের বেড, রোগীর আগের চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থাপত্র, টেস্ট রিপোর্ট এ সব কিছুই অনলাইনে জানতে পারবেন চিকিৎসকরা।

নগরের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দিতে ৩৬টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এসব কেন্দ্র তদারকি করবে সিলেট সিটি করপোরেশন। ডিজিটাল সিলেট সিটির নাগরিকরা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস বিল, কর সবই পরিশোধ করতে পারবেন অনলাইনে। জানতে পারবেন আবেদন ও অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থাও।

পর্যটন নগর সিলেটে বেড়াতে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য পর্যটন বিষয়ক ওয়েবসাইট তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া নাগরিকদের জন্য ডিজিটাল টেলিফোন ডিরেক্টরিও করা হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে সিলেট নগরের প্রবাসীদের তথ্য হালনাগাদ করা হবে। প্রবাসীদের বাড়তি সুবিধা দিতে বিভিন্ন সেবা সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে যুক্ত করা হবে। ফলে প্রবাসীরা দেশে এলে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা থেকে সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। আইসিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল শহরের বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)।

প্রতিবেদন: ফারহানা হোসেন

নিবন্ধ

পর্যটনে অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ

হোসেন জাহিদ

জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (ইউএনডাব্লিউটিও) উদ্যোগে ১৯৮০ সাল থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যটন দিবস সারা বিশ্বে পালন করা হয়। পর্যটন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে দিবসটি নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে। পর্যটনের ভূমিকা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উপযোগিতাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া এ দিবসের লক্ষ্য।

ফটোফিচার: মো. ফরিদ হোসেন

বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মূল উদ্দেশ্য টেকসই পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে সমঝোতা ও শান্তি সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি আনায়ন করা। দিবসটি পালনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মধ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ব বোধ তৈরি হয়। সচেতনতা সৃষ্টিতেও পর্যটন দিবস ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এদেশের পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা। আর এই সম্ভাবনার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করার কথা চিন্তা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পর্যটন শিল্প করপোরেশন সৃষ্টি করেছিলেন।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পর্যটন হচ্ছে বিশ্বের একক সর্ববৃহৎ ও খুব দ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্প। এই শিল্পের বিকাশে করপোরেশনের জন্মলগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব এবং সরকারি অর্থায়নে পর্যটন নগরী কক্সবাজার, বৃহত্তর চট্টগ্রাম, সিলেট, কুয়াকাটা, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, যশোর, মেহেরপুরসহ অন্যান্য আরো বেশ কিছু এলাকায় হোটেল, মোটেল, পিকনিক স্পট, রেস্তোরাঁ ও পর্যটন সুবিধাসমূহ সৃষ্টি করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সেবাপ্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে পরিচিত ও জাতীয় অর্থনীতিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগারের এ দেশটিতে আনুমানিক প্রায় পাঁচশ বিভিন্ন আকৃতির ঐতিহাসিক পর্যটন স্থান রয়েছে। সারা বিশ্বে পর্যটকদের সংখ্যা ধরা হয় প্রায় ৯০ কোটি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা আগামী ২০২০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা গিয়ে ১৬০ কোটিতে দাঁড়াবে। এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বর্ধনশীল। আর বিশাল এই সংখ্যার ৭৩ শতাংশ ভ্রমণ করবে এশিয়ার আকর্ষণীয় দেশগুলোতে। যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এই শিল্প থেকে প্রচুর আয় হবে এবং একইসঙ্গে বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হবে। এই অর্থনৈতিক উন্নতি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। বাংলাদেশ পর্যটন খাতে যদি এগিয়ে যেতে পারে তবে এই খাত ধরেই দেশের অর্থনৈতিক চাকা বিশেষভাবে সচল হতে পারে।

সমগ্র বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভাব নেই। সেই সঙ্গে এদেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি, নদনদী, সভ্যতা, ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ, গ্রামীণ পরিবেশ যে-কোনো পর্যটকের মন কাড়ে। বাংলাদেশে পর্যটনের জন্য যে অঞ্চল রয়েছে– কক্সবাজার, কুয়াকাটা, সুন্দরবন, সেন্ট মার্টিন, রাঙামাটি, হিমছড়ি, জাফলং, মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, খাগড়াছড়ি, নীলগিরি, নীলাচল, চলনবিল, মহাস্থানগড়, শুভলং ঝরনা, সোমপুর মহাবিহার, লাউয়াছড়া বন, কান্তজির মন্দির, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, মনপুরা, বিছানাকান্দি, মাধবপুর চা বাগান ও হ্রদ, নিঝুম দ্বীপ, উয়ারী বটেশ্বর, ইদ্রাকপুর দুর্গ, ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাউল সম্রাট লালন শাহের মাজার, লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, শিখা চিরন্তন, বাহাদুর শাহ পার্ক, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, রমনাপার্ক, বঙ্গবন্ধু সেতু, হাসন রাজার বাড়ি, তেলিয়াপাড়া স্মৃতিসৌধ ও বাংলো, তাজহাট জমিদার বাড়ি, হাতিরঝিল, মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্স, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে আরো বেশ কতকগুলো পর্যটন স্থান রয়েছে। যেমন– বরিশালের দুর্গাসাগর, খাগড়াছরি হাতির মাথা সিঁড়ি, মায়াবিনী লেক, তৈদুছড়া ঝরনা, লেক পাহাড় ঝুলন্ত সেতুর হর্টিকালচার পার্ক, মৌলভীবাজারের ৩ পাহাড়, টাঙ্গুয়ার হাওড়, ঝালকাঠির ভাসমান বাজার, মানিকগঞ্জের বালিয়াটি জাদুঘর, দিনাজপুরের কাঠের সেতু, ধলেশ্বরী নদীর কোল ঘেঁষে শাহ মেরিন রিসোর্ট, বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী সোনার চর, রাঙামাটির কলাবাগান ঝরনা, পতেঙ্গা সি-বিচ, তিস্তা-ধরলার তীর, বাগেরহাটের ডিসি ইকোপার্ক, ভোলার তোফায়েল উদ্যান, খুলনার ওয়াইসি রিসোর্ট, নাটোরের হালতিবিল ইত্যাদি।

বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম

দেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহের বহুমাত্রিকীকরণ ও উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করা বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যেকে সামনে রেখে বিমানকে বিশ্বমানের অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে নিরাপদ, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সুবিধাদি প্রদানে সক্ষম ও নির্ভরযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। এছাড়া বিমান পরিবহণেও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করছে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ। সেই সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সচেতন রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

* বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, যুগোপযোগীকরণ এবং এর বাস্তবায়ন
* বিমান বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন, বিমানপথ ও বিমান সার্ভিসসমূহের সমন্বয়সাধন

* আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ, বিমান উড্ডয়নের নিরাপত্তা বিধান, এ্যারোনটিক্যাল পরিদর্শন এবং উড়োজাহাজ ও বৈমানিকের লাইসেন্স প্রদান

* বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন সম্পর্কিত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন এবং সমন্বয়সাধন

* জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা ও সেবার মান বৃদ্ধি

* ট্রাভেল এজেন্সি ও হোটেল/রেস্টুরেন্টসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ

* পর্যটন পণ্যের উন্নয়ন ও বিপণন এবং পর্যটন শিল্প বিকাশে গবেষণা, আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি

* পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে পর্যটন সংক্রান্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং

* কার্যকর কমিউনিটি অংশগ্রহণের নিশ্চিত করে পর্যটনের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও স্থানীয় পণ্য ও সংস্কৃতির প্রসার।

দক্ষ ও মানসম্মত কার্গো পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

বিমানে কার্গো পরিবহণ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হলে নারীদের কর্মসংস্থানও বাড়বে, যা নারী উন্নয়নে পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে। ফলে এ কৌশলগত উদ্দেশ্যটি নারীদের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করবে।

পর্যটনের বিকাশ

দেশে পর্যটক ও পর্যটন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি তথা পর্যটকদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। পর্যটন একটি বহুমাত্রিক এবং শ্রমঘন শিল্প। এ শিল্পে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়াও পরোক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। দেশে পর্যটন কেন্দ্র ও পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তার আশপাশে বসবাসরত নারীরা তাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদিত পণ্য পর্যটকদের নিকট বিক্রয় করে আয় বৃদ্ধি করতে পারে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর বিভিন্ন ইউনিটে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীসহ স্থানীয় নারীদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ডিউটি ফ্রিশপেও নারীদের তৈরি বিভিন্ন পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের হোটেল, মোটেলসমূহে রিসিপশন, হাউজ শিপিং, কিচেন, এমনকি হোটেল ব্যবস্থাপক হিসেবেও নারীকর্মীগণ কাজ করছেন। অন্যদিকে, বেসরকারি হোটেল-মোটেলেও নারীকর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক ইকোট্যুরিজম শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পর্যটন শিল্পের বিকাশের স্বার্থে মন্ত্রণালয় গৃহীত কতিপয় সুপারিশ

* পর্যটন শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে অন্যান্য সংযোগ শিল্পেরও বিকাশ ঘটে। এর মধ্যে হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণই বেশি। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এসব কাজের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের স্বাবলম্বী করতে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সরকারিভাবে সহায়তার উদ্যোগ নেওয়া হবে

* হোটেল ব্যবস্থাপনায় নারীদের কাজের প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সার্বিকভাবে পর্যটন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য পর্যটন শিল্প বিকাশে নারীদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে

* বিমানের কেবিন ক্রু, হোটেল ও হসপিটালিটি ব্যবস্থাপনা, পেশাদার ট্যুর গাইড ইত্যাদি পেশায় দক্ষ নারীকর্মী নিয়োগের সুযোগ কাজে লাগানো যেতে পারে। ইংরেজি ভাষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে নারীকর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে

* পর্যটকদের জন্য পল্লি আবাসের মাধ্যমে সামাজিক ইকো-ট্যুরিজম শিল্প নারীদের সেবা প্রদানের বিশাল ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। বিশেষত পাহাড়, হাওর ও বন এলাকায় এরূপ সম্ভাবনা বেশি। এ কারণে ইকো-ট্যুরিজম বিকাশে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং

* পর্যটন শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত নারীদের হস্তনির্মিত পণ্যসামগ্রী Duty Freeshop-এ বিপণনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গত অর্থবছরে ৫ বছরের পর্যটন খাতে সরকারি অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতির বিবরণ (লক্ষ টাকা):

অর্থবছর	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ	অগ্রগতি
২০১২-২০১৩	১২৫৫.২৫	১৮৬২.৬৬	৯৩.৪১%
২০১৩-২০১৪	৫৯৫.০০	৬৪৪.৮১	৯৯.৯৭%
২০১৪-২০১৫	২১৪৯.০০	২০৭৪.৪২	৯১.৯৭%
২০১৫-২০১৬	৫৭০.০০	৫৪১.২৯	১০০%
২০১৬-২০১৭	১৪৯.৮১	১৪৯.৮১	১০০%

গত ৫ বছরের বিদেশি পর্যটক আগমন পরিসংখ্যান এবং সরকারের আয়ের পরিমাণ:

বছর	পর্যটক আগমনের সংখ্যা	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১২	৫,৮৮,১৯৩ জন	৮২৫.৪০
২০১৩	২,৭৮,৭৮০ জন (১ম ছয় মাসের)	৯৪৯.৫৬
২০১৪	-	১২২৭.৩০
২০১৫	-	১১৩৬.৯১
২০১৬	-	৮০৭.৩২

টিটিসিআই রিপোর্ট ২০১৯

ভ্রমণ ও পর্যটনে ৫ ধাপ এগিয়ে ১২০ নম্বরে বাংলাদেশ। দুই বছরের ব্যবধানে ভ্রমণ ও পর্যটনে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এই সময়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ অগ্রগতি হয়েছে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। এতেই ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের দ্য ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম টিটিওনেস রিপোর্ট টিটিসিআই ২০১৯-এ বাংলাদেশ উঠে এসেছে ১২০ নম্বরে।

পর্যটন শিল্পের যথাযথ বিকাশ ও এই খাতকে অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এছাড়া দেশের সার্বিক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিসহ চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হলে দৃশ্যমান হবে মেট্রোরেল, পদ্মাসেতু, কর্ণফুলী ট্যানেল, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টসহ অন্যান্য অবকাঠামো যা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সেই সাথে প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন হলে পর্যটন খাত আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯

মিতা খান

সাক্ষরতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবীয় অধিকার হিসেবে বিশ্বে গৃহীত হয়ে আসছে। এটি ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ও মানবীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এমনকি শিক্ষার সুযোগের বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করে সাক্ষরতার ওপর। সাক্ষরতা মৌলিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে। দারিদ্র্য হ্রাস, শিশুমৃত্যু রোধ, সুষম উন্নয়ন এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি বিকশিতকরণের ক্ষেত্রেও সাক্ষরতা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। সাক্ষরতার মূল কথা সবার জন্য শিক্ষা। তাই একটি মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা মানুষকে সাক্ষরতা ও দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করতে সহায়তা করে। কারণ বিশ্বের সকল উন্নয়ন ও আবিষ্কারের মূলমন্ত্রই হচ্ছে শিক্ষা। মানবসম্পদ উন্নয়নে এর কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষাহীন মানুষ আর পশুতে কোনো তফাৎ নেই। যার শিক্ষা নেই বলা যায় তার কিছুই নেই। তাই ইউনেস্কো সারা বিশ্বে জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

দেশে দেশে সাক্ষরতার সংজ্ঞা অনেক আগে থেকে প্রচলিত থাকলেও ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কো প্রথম সাক্ষরতার সংজ্ঞা চিহ্নিত করে এবং পরবর্তী সময়ে প্রতি দশকেই এই সংজ্ঞার রূপ পালটেছে। এক সময় কেউ নাম লিখতে পারলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো। কিন্তু বর্তমানে সাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য অন্তত তিনটি শর্ত মানতে হয়, যেমন– ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য পড়তে পারবে, সহজ ও ছোটো বাক্য লিখতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে পারবে। এই প্রত্যেকটি কাজই হবে ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বে বর্তমানে এই সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে সাক্ষরতার হিসাব-নিকাশ করা হয়। ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কো এই সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করে, তবে বর্তমানে এটিও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। অনেক আন্তর্জাতিক ফোরাম বা কনফারেন্স থেকে সাক্ষরতার সংজ্ঞা নতুন ভাবে নির্ধারণের কথা বলা হচ্ছে যেখানে সাক্ষরতা সরাসরি ব্যক্তির জীবনযাত্রা পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত হবে।

সাধারণত সাক্ষরতা বলতে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্নতাকে বোঝায়। তবে এক সময় শুধু স্বাক্ষর জ্ঞানকেই সাক্ষরতা বলা হতো। কিন্তু দিন দিন এর পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসরে সাক্ষরতা শব্দের প্রথম উল্লেখ ১৯০১ সালে লোক গণনার অফিসিয়াল ডকুমেন্টে। তখন স্ব অক্ষরের সঙ্গে অর্থাৎ নিজের নাম লিখতে যে কয়টি বর্ণমালা প্রয়োজন তা জানলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো। ১৯৪০'র দিকে পড়ালেখার দক্ষতাকে সাক্ষরতা বলে অভিহিত করা হতো। আর ষাটের দশকে পড়া ও লেখার দক্ষতার পাশাপাশি সহজ হিসাব-নিকাশের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ সাক্ষর মানুষ হিসেবে পরিগণিত হতো। আশির দশকে লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশের পাশাপাশি সচেতনতা ও দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী পঠনের ক্ষমতা সাক্ষরতার দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃত হয়। বর্তমানে এ সাক্ষরতার সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা, ক্ষমতায়নের দক্ষতা, জীবন নির্বাহী দক্ষতা, প্রতিরক্ষায় দক্ষতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতাও সংযোজিত হয়েছে।

১৯৬৫ সালের ৮-১৯শে সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর উদ্যোগে ইরানের তেহরানে ৮৩টি দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষামন্ত্রী ও পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ওই সম্মেলনে প্রতিবছর ৮ই সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব করা হয়। পরে ১৯৬৫ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ৮ই সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৬৬ সালে ইউনেস্কো প্রথম দিবসটি উদ্‌যাপন করলেও ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। প্রতিবছরের মতো এবারো বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালন করেছে। এ উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এ বছর ইউনেস্কো এ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'লিটারেসি অ্যান্ড মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম'। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলায় প্রতিপাদ্য করা হয়েছে 'বহু ভাষায় সাক্ষরতা, উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা'। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে বলেন, শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনে সাক্ষরতা কর্মসূচিকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। তিনি এলক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শিশুরা মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষা লিখলে, তা বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরো দৃঢ় করবে। একই সঙ্গে নতুন নতুন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজের জীবনমান উন্নয়ন এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দানের লক্ষ্যে ৬৪ জেলায় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১-এর অন্যতম লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে শুধু লেখাপড়া নয়, মানুষের জ্ঞান, সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যা সুস্থ সমাজ ও উন্নত দেশ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর আলোকেই সরকার ইতোমধ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' এবং 'ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেছে।

বর্তমান সরকারের শিক্ষা খাতে বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিকে ভর্তির হার প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে, ঝরে পড়া এবং বাল্যবিয়ে কমেছে। প্রাথমিকের এক কোটি ৩০ লাখ শিশু উপবৃত্তি পাচ্ছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও অর্জিত হয়েছে জেন্ডার সমতা। কারিগরি শিক্ষায় বর্তমানে শিক্ষার্থীর হার ১৪ শতাংশ। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় চার কোটি শিশু বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে বই পায়। সাক্ষরতার হার ১০ বছরে বেড়ে হয়েছে ৭৩ শতাংশ, যা শিক্ষা অবকাঠামোতেও বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

শিক্ষাবিদরা বলেন, বিনা মূল্যের বই, উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিংসহ সরকারের নানা পদক্ষেপের ফলে শিক্ষা খাতে সুফল মিলছে এখন।

বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার ৫১ শতাংশ আর ছেলেদের ৪৯ শতাংশ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অংশগ্রহণ মেয়েদের ৫৩ শতাংশ ও ছেলেদের ৪৭ শতাংশ। ২০০৯ সালে দেশের ৯ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে যেত না। তাদের মধ্যে আবার ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ত। বর্তমানে প্রায় শতভাগ শিশুকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, যা সরকারের একটি অন্যতম অর্জন।

গত ১০ বছরে সরকারের অন্যতম অর্জন সব শিশুর হাতে বছরের প্রথম দিনেই বিনামূল্যের বই তুলে দেওয়া। প্রতিবছর চার কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী ৩৬ কোটি বই পাচ্ছে বিনামূল্যে। তবে এখন চ্যালেঞ্জ এসডিজি অর্জন। এলক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সব শিশুকে প্রাক-শৈশব উন্নয়ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করাই যার লক্ষ্য।

শিক্ষা খাতের নানা উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। সেলক্ষ্যে জোরদার করা হয়েছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, গত ১০ বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংখ্যাগত অর্জনটা বেশি। আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, জেন্ডার সমতা নিশ্চিত হয়েছে। একইসঙ্গে ভৌত সুবিধাও বেড়েছে। বিনামূল্যে বই দেওয়া, একযোগে ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা সরকারের বড়ো অর্জন।

২০০৯ সালে বাংলাদেশে কারিগরিতে এই হার ছিল ১ শতাংশেরও কম। বর্তমানে কারিগরিতে শিক্ষার্থীর হার ১৪ শতাংশে পৌঁছেছে। সরকার ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ শতাংশ এবং ২০৩০ সালে ৩০ শতাংশে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে। অধিকসংখ্যক মেয়েকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ২০ শতাংশ কোটা চালু করা হয়েছে। মেয়েদের জন্য সাত বিভাগে করা হয়েছে সাতটি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও। কারখানার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৩ হাজার ৩৩১টি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় স্থাপন করা হয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। ৬৫ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামের শিক্ষার্থীরাও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে পড়ালেখা করছে।

আগে এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা, কলেজে ভর্তি ও ক্লাস শুরু হওয়ার নির্ধারিত কোনো সময় ছিল না। পরীক্ষার ফল বের হতে তিন-চার মাস লাগত। কিন্তু এখন সব কিছুতেই ফিরে এসেছে শৃঙ্খলা। প্রতিবছর ১লা ফেব্রুয়ারি এসএসসি এবং ১লা এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আর নিয়মিতই ৬০ দিনের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফল। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকের ক্লাস শুরু হয় ১লা জানুয়ারি। আর উচ্চ মাধ্যমিকে ক্লাস শুরু হয় ১লা জুলাই।

একসময় স্কুল ভবন ছিল মলিন চেহারার। কিন্তু বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পছন্দ করা নকশায় নির্মিত হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন ভবন। শিক্ষার্থীরা যাতে স্কুলভবন দেখেই আকৃষ্ট হয় সেভাবে ভবন নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে মোট ১২ হাজার ৪৯৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে ১০ হাজার ৩০১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণকাজ পুরোপুরি সমাপ্ত হয়েছে এবং দুই হাজার ১৯৮টি প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি প্রায় ১৫ হাজার ৬৫০ কোটি টাকার দুটি মেগা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ছয় হাজার ২৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় গত দশ বছরে দেশে সাক্ষরতার হার ২১ শতাংশ বেড়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে ৫০ লাখ নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের পাশাপাশি নতুন সাক্ষরতা অর্জনকারী ১৫-৪৫ বছর বয়সি ৫ লাখ যুব ও বয়স্ক ব্যক্তিকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বর্তমানে ২৫০টি উপজেলার ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সি ৪৫ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৩৪টি উপজেলায় ২৩ লাখ ৫৯ হাজার ৪৪১ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা এমডিজি বাস্তবায়ন করেছি। এখন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং জাতীয় অঙ্গীকারের সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এলক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে প্রাথমিকভাবে ৫০০টি আইসিটি বেইজড স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার ও ৬৪ জেলায় ৬৪টি জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

তিনি আরো বলেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে জড়িত সারাদেশের সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা নিরূপণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেন, বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান প্রদান করা হয়। সাক্ষরতা বিস্তারে এ বিশাল অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ইউনেস্কো কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮' লাভ করে। 'সবার জন্য শিক্ষা' এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ' অর্জনে সাফল্যের জন্য ২০১৪ সালে ইউনেস্কো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'শান্তিবৃক্ষ' পদক প্রদান করে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা রয়েছে ৪ নম্বরে। এখানে অন্তর্ভুক্তমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এতে ২০৩০ সালের মধ্যে দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের কথাও বলা হয়েছে। আশার কথা, আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও ও সুশীল সমাজ এসডিজির ৪ নম্বর লক্ষ্য নিয়ে নানামুখী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রাটি অর্জিত হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কাজটিও সহজ হয়ে যাবে।

লেখক: কপি রাইটার, সচিত্র বাংলাদেশ, ডিএফপি

ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি

মিয়াজান কবীর

কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন দুর্জয়-দুর্বার। জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের মতো ছিল তাঁর উদ্দাম-চঞ্চল শক্তি। প্রলয় শিখার মতো জ্বলে উঠেছিলেন কবি। তাইতো যেখানে দেখেছেন অন্যায়-অবিচার সেখানেই তিনি রুদ্ররোষে ফেটে পড়েছেন, করেছেন বিদ্রোহ। বাজিয়েছেন বিষের বাঁশি, অগ্নিবীণা। সগৌরবে বজ্রকণ্ঠে করেছেন ঘোষণা:

বল বীর–
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির।

এই বিদ্রোহী কবির (১৮৯৯-১৯৭৬) সাতাত্তর বছর জীবনে সাহিত্য সাধনারত ছিলেন মাত্র বিয়াল্লিশ বছর। ১৯৪২ সালের ১০ই জুলাই কলকাতা বেতারে একটি অনুষ্ঠানে আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন কবি। বাকশক্তি হারা হয়ে চিরজনমের মতো নির্বাক হয়ে যান। কবির জীবনে এই দুর্দশা একদিনে হয়নি। কবি ছিলেন খেয়ালি মানুষ। শরীরের প্রতি কোনো যত্ন নেননি। সাংসারিক অভাব-অনটন আর দরিদ্রতার ভেতর অতিবাহিত হয়েছে সারাটি জীবন। তার মধ্যে সাহিত্য সাধনায় ছিলেন নিমগ্ন। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি ছিলেন উদাসীন। এতে শরীরে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। প্রেম-বিরহের বেদনায় মন হয়ে পড়ে ভারাক্রান্ত। ব্রিটিশ সরকারের রাজরোষে পড়ে হয়েছেন বন্দি, গিয়েছেন কারাগারে, সয়েছেন সীমাহীন নির্যাতন। ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন কবির গ্রন্থাবলি। পরেছেন আর্থিক সংকটে।

বৈরী পক্ষ নজরুলকে কাব্য যুদ্ধে পরাস্ত করার লক্ষ্যে বের করেছিলেন *শনিবারের চিঠি*। কবির কবিতার ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ প্যারোডি লিখে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। *শনিবারের চিঠি*র গোষ্ঠী। এতে কবি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, স্বজাতি কবিকে কাফের বলে করেছিল আখ্যায়িত আর হিন্দু সমাজ তাঁকে যবন বলে দিয়েছিল গালাগাল। তাছাড়া প্রাণপ্রিয় পুত্র বুলবুলের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে পড়েন কবি।

অসুস্থ পুত্র বুলবুলের শয্যা পাশে বসে রাত জেগে কবি 'রুবাইত-ই-হাফিজ' বঙ্গানুবাদ শুরু করেন। এ সময় কবিপুত্র বুলবুল পৃথিবীর মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে চিরজনমের মতো চলে যায় না ফেরার দেশে। কবি তাঁর পুত্র বুলবুলের বিয়োগ ব্যথায় মর্মাহত হন। বুলবুলের স্মৃতিকে চির জাগরূক করে রাখতে 'রুবাইত-ই-হাফিজ' বুলবুলের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন:

বাবা বুলবুল।
তোমার মৃত্যু-শিয়রে বসে 'বুলবুল-ই-শিরাজ' হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি, যেদিন অনুবাদ শেষ করে উঠলাম, সেদিনই তুমি আমার কাননের বুলবুলি উড়ে গেছ। যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর?
জানি না তুমি কোথায়। যে-লোকেই থাক, তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন বলে গ্রহণ করো।
শিরাজি-বুলবুল কবি হাফেজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি–
সোনার তাবিজ, রূপার সেলেট
মানাত না বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শিয়রে তার।

কবি তাঁর একটি গানে লিখেছেন:

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি।
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি।
ফুল ফুটিয়ে ভোর বেলাতে গান গেয়ে
নীরব হল কোন নিষাদের বাণ খেয়ে
বনের কোলে বিলাপ করে
সন্ধ্যারাণী চুল খুলি।
কাল হতে আর ফুটবেনা হায়
লতার বুকে মঞ্জরী
উঠছে পাতায় পাতায় কাহার
করুণ নিশাস মর্ম্মরি।
গানের পাখী গেছে উড়ে, শূন্য নীড়
কণ্ঠে আমার নাই যে আগের কথার ভীড়
আলেয়ার এ আলোতে আর
আসেনা কেউ কুল ভুলি ॥

কবিপুত্র বুলবুলের মৃত্যুর কিছুদিন পর ১৯৩৯ সালে কবি জায়া প্রমীলা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়িত হন। প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন কবি। স্ত্রীর চিকিৎসার টাকার জন্য কম দামে বইয়ের স্বত্ব বিক্রি করে দেন। যে যা বলতে থাকেন সেই কথা মতো প্রিয়তমা স্ত্রীকে সুস্থ করতে কাজ করতে থাকেন কবি।

কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-বেদনার কথা তাঁর কবিতা, কাব্যগীতি কিংবা চিঠির মাধ্যমে করেছেন প্রকাশ। শামসুন নাহার মাহমুদ এক চিঠিতে নজরুলের জীবনের কথা জানতে চেয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে নজরুল লিখেছিলেন–

আমার জীবনের ছোট ছোট কথা জানতে চেয়েছ। বড় মুশকিল কথা ভাই। আমার জীবনের যে বেদনা, যে রঙ তা আমার লেখায় পাবে। অবশ্য লেখার ঘটনাগুলো আমার জীবনের নয়, লেখার রহস্যটুকু আমার, ওর বেদনাটুকু আমার। ঐখানেই তো আমার সত্যিকার জীবনী রয়ে গেল।

কবি জীবদ্দশায় তাঁর জীবন যবনিকার ছায়াপাত অনুভব করেছিলেন। মৃত্যুর আতিশয্যে বিহ্বলতায় বন্ধুকে লেখা একটি চিঠিতে ফুটে উঠেছে সেসব কথাচিত্র।

কবি নজরুল ইংরেজ কবি শেলী, কীটস ও বায়রনের করুণ ট্র্যাজেডি মরমে মরমে উপলব্ধি করেছেন। কবির জীবনে যে তাঁদের জীবনের মতো করুণ পরিণতি ঘটতে পারে, সে বিষয় উপলব্ধি করে তাঁর পরম বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন–

> আমার জীবনের সবচেয়ে গোপন করুণ পাতায় লেখাটি তোমার কাছে লিখে গেলাম। আমার দিক দিয়ে এর একটা কী যেন প্রয়োজন ছিল।
>
> আচ্ছা আমার রক্তে রক্তে শেলীকে কীটসকে এত করে অনুভব করছি কেন? বলতে পার? কীটসের প্রিয় ফ্যানিকে দেয়া তাঁর কবিতা পড়ে মনে হচ্ছে যে এ কবিতা আমি লিখেই গেছি।... কণ্ঠ প্রদাহ রোগে আমি ভুগছি ঢাকা থেকে এসে অবধি, রক্তও উঠছে মাঝে মাঝে। আর মনে হচ্ছে আমি যেন কীটস। সে কোন ফ্যানির নিষ্করুণ নির্মমতায় হয়ত বা আমারও বুকের চাপ ধরা রক্ত তেমনি করে কোন দিন শেষ ঝলক উঠে আমায় বিয়ের বরের মত করে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।
>
> তারপর হয়ত বা বড় বড় সভা হবে। কত প্রশংসা কত কবিতা বেরুবে হয়ত আমার নামে। দেশ প্রেমিক, ত্যাগী, বীর বিদ্রোহী বিশেষণের পরে বিশেষণ। টেবিল ভেঙে ফেলবে থাপ্পর মেরে বক্তার পর বক্তা।

আরো লিখলেন তাঁর মনের খেদোক্তি–

> এই অসুন্দর শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রাদ্ধদিনে বন্ধু। তুমি যেন যেয়ো না। যদি পার চুপটি করে বসে আমার অলিখিত জীবনের কোনো একটি কথা স্মরণ কর। তোমার ঘরের আঙিনায় বা আশেপাশে যদি একটা ঝরা পায়ে পেষা ফুল পাও, সেইটাকে বুকে চেপে বল বন্ধু, আমি তোমায় পেয়েছি।

কবি ভাব বিহ্বলতায় আরো লিখলেন–

> আকাশের সবচেয়ে দূরের যে তারাটির দীপ্তি চোখের জলকণার মত ঝিলমিল করবে মনে করো, সেই তারাটি আমি। আমার নামে তার নামকরণ করো। কেমন?

কবির ব্যর্থ প্রেমের দীর্ঘশ্বাসে চিরবিদায় স্মৃতিতে বিদীর্ণ হৃদয়ের আর্তি ফুটে উঠেছে:

> মৃত্যু এত করে মনে করছি কেন জান? ওকে আজ আমার সবচেয়ে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে বলে। মনে হচ্ছে জীবনে যে আমায় ফিরিয়ে দিলে, মরণে সে আমায় বরণ করে নেবে।

অভিমানী কবির অভিমান সুর অনুরণিত হয়েছে:

> যেদিন আমি ঐ দূর তারার দেশে চলে যাব– সেদিন তাকে বলো, দেখিয়ে তাকে যেন দুটি ফোঁটা অশ্রুর তর্পণ দেয় শুধু আমার নামে। হয়ত আমি সেদিন খুশিতে উল্কা ফুল হয়ে তার নোটন খোঁপায় ঝরে পড়ব।

কবি তাঁর এক ভক্ত মাহফুজুর রহমান খানের কাছে ১৯২৭ সালে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে লেখা ছিল–

> এককালে ধূমকেতুর মতো ঘুরে বেড়িয়েছি বলেই আজ ধ্যান-শান্ত হবার সাধনা করছি একান্ত নিরালায় সরে গিয়ে।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর উচ্ছ্বাস-উল্লাস দেখে বলেছিলেন–

> দেখ, উম্মাদ, তোর জীবনে শেলীর মতো, কীটসের মতো খুব বড়ো ট্র্যাজেডি আছে, তুই প্রস্তুত হ।

কবি নজরুলও অনুভব করতে পেরেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ পরিণতি। তাই বুঝি বাকরুদ্ধ হবার মাত্র এক বছর আগে ১৯৪১ সালে ৫ ও ৬ই এপ্রিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির জুবিলি উৎসবে কবি নজরুল তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন–

> যদি আর বাঁশি না বাজে আমি কবি বলে বলছিনে, আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি-আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন আমায় আপনারা ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম, সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

কবি নজরুল তাঁর মাতৃপ্রতীম বিরজাসুন্দরী দেবীর কাছে লেখা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন–

> প্রাচ্যের ঋষিরা মৃত্যুকে কখনো জীবনের শেষ বলে মানেননি, বড় করে দেখেননি। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আত্মীয়েরা পরমাত্মীয় হন, প্রিয়জন প্রিয়তর হন। জীবনে যে থাকে চোখের সামনে মরণে সে-ই পায় অন্তরের অন্তরতম লোকে অক্ষয় আসন, মৃত্যু জীবনের পরম পরিণতির এক একটা ধাপ মাত্র। মৃত্যুর সিঁড়ি বেয়ে আমরা অগ্রসর হই অমৃত লোকের পানে, ভগবানের সান্নিধ্যে। তবু মৃতজনের জন্য আমরা কাঁদি আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলে। ছোট মাসিমা'র মৃত্যু যদি কয়েক বছর আগে হত খুব কাঁদতাম। এখন কাঁদিনা। এখন আমার জীবনের যেন এই জীবনেই নবজন্মের সূচনা অনুভব করছি। মায়াময় সৃষ্টির বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি।

মৃত্যুর চিন্তায় কবি ব্যাকুল হয়ে উঠেন। মৃত্যুই যেন অমৃতলোকে, স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে সেতুবন্ধ করে। তাই তাঁর কবিতায় সেসব চিত্র ফুটে উঠেছে।

কবি ছিলেন ধ্যানী পুরুষ। ১৯২৯ সালে চট্টলায় বসে বাতায়ন পাশে গুবাকসারির বাতায়ন পাশে কবিতায় লিখেছিলেন–

> তোমাদের পনে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না।
> কোলাহল করি সারামান কারো ধ্যান ভাঙিব না।
> নিশ্চল নিশ্চুপ
> আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধূর ধূপ।

কবি অভিমানে দীর্ঘদিন ধ্যানস্তিমিত ছিলেন। দুচোখ ভরে দেখেন সংসার সমাজের ব্যথা-বেদনা। একাকী সেই ব্যথা-বেদনায় নিজে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরেছেন। কারো কাছে তাঁর ছিল না কোনো অভিযোগ।

নজরুল আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি এই চির সবুজ মায়াবী পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন অনন্ত পথে কিন্তু রেখে গেছেন গানের সুর-সুধা, কবিতা-মঞ্জুরী। কবি নিজেই লিখে গেছেন তাঁর জীবনের কাব্যকথা–

> চেনার বন্ধু, পেলাম নাক জানার অবসর
> গানের পাখি বসেছিলাম দুদিন শাখার পর
> গান ফুরালে যাব যবে
> গানের কথাই মনে রবে
> পাখি তখন থাকবে নাক থাকবে পাখির স্বর
> উড়ব আমি কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর।

কবি সেই সুন্দর পৃথিবী আবার বিষাদঘন ছায়ায় কবির মনকে আড়ষ্ট করে তুলেছে। তাই শুনতে পাই সেই বিষাদের সুর–

> আজ চলে যাই এই পৃথিবীর আর লাগে নাকো ভালো,
> হেথা মানুষের নিঃশ্বাসে নিভে যায় গো প্রেমের আলো।

কবি নজরুল এই ধূলি-ধূসর পৃথিবীর মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে চলে গেছেন অনন্তলোকে। রেখে গেছেন কবিতা গান আর চিঠির ভাষায় আকুতি ভরা গহীন মনের মর্ম বেদনা। কবি নিজেই নিজের বেদনার কথা লিখেছেন কবিতার ভাষায়–

> অমর হইয়া আছে রবে চিরদিন
> তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
> ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি।

লেখক: সাহিত্যিক ও গবেষক

অচিন মূকাভিনয়

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

উপহাস হঠাৎ-ই চলে আসে
তার চোখে তপ্ত মেঘ, চোখে গন্ধবালি
পাশাপাশি সরোবর
যত পর তত খর দু'দণ্ডের ঠাঁই
পরানে কি নাই সখা কোনো রোশনাই?
সত্য যে আনাড়ি
জামা থেকে সুতো খুলে ফুরসত ওড়ায়
যত ভয় তত সন্ধ্যা-ক্ষয়
কলরবে বৃদ্ধি পায় খোয়াবের ধুলো
ওলো নিদ্রা, তোরও কি নেই কোনো অসমাপ্ত স্বর?
মাটি লেখা যাবতীয় জলের শৈশব
স্মৃতিসহ ধরে রাখে ঋণের হলুদ
কোনোদিন নিলামের প্রশ্ন দেখা দিলে
শস্যও সম্মুখে আসে, মেটে তৃষ্ণা-ক্ষুধা
ইঁদুরের দাঁতে লাগে খাদ্যের বাহানা!
অভিমান, বৈশাখের বিস্তারিত টান
দূরবর্তী উপত্যকা ব্যাপী ঠিকানা-সন্ধান
বৃত্তের কানুন আর বৃদ্ধ জাদুকলা
অসময়ে খোরপোশে সূত্রহীন হলে
দরোজা পেরুতে আসে অচিন মূকাভিনয়!

ভাঙাপোড়া জোড়া পঙ্‌ক্তি

হাসান হাফিজ

ডুবে যাচ্ছি কবিতা-শব্দের খনি, কাব্যলক্ষ্মী পাতালে তোমার
জানি না সামনে আছে কী প্রচণ্ড বাধাবিঘ্ন শত্রু পারাবার
শব্দের পিপাসা তীব্র, এত ঘন, আগে তা জানিনি কোনও দিন
বিলম্বে জেনেছি, তবু স্বীকার করছি তার মাদকতা অক্টোপাস-ঋণ
যেতে সে চেয়েছে যাক, গিয়ে যদি সুখী হয় আপত্তি কিসের
আমার সান্নিধ্য হয়ত ওর কাছে কাম্য নয়, অসহ্য বিষের
ভালোবাসা ভালো থেকো, তোমার সুস্থিতি কিন্তু চায় না সবাই
সঞ্জীবনী কতটা ধারণ করো, ছিটেফোঁটা আমিও তো চাই
ভাঙতে বড়ো ভালোবাসো, জোড়া লাগবে সেই আশা কম
জোড়া দেওয়া সম্ভবে না, কারণ ফুরিয়ে গেছে সবটুকু দম
তুমি প্রেম, দুঃখ তুমি, শূন্য খাঁচা, আবেগের অন্ধ অপচয়
পরাস্তের সঘন ক্রন্দন তুমি দুঃখতাপ আর্তিজরা ক্ষয়
স্তব্ধতার সঙ্গে দেখা, জলের অক্ষরে লেখা স্তব্ধতা কী নদী
বুকের ভেতরে ঝোরা, আবেগে প্রবহমান একা নিরবধি
এক জন্মে তিয়াসা যে পূরবে না, মনোবাঞ্ছা থাকবে অপূরণ
জানা ছিল, তারপরও তৃষ্ণার ছোবলে আউল হইল দেহমন।

বিশ্ববিবেক বিস্মিত হয়

শাফিকুর রাহী

একজনমে এত কান্না কে সয়েছে অমন করে ধ্যানমগ্ন তপস্যাতে;
এত দুঃখ-শোক পাথারে আগুন জলে কে ভেসেছে অনিশ্চিত অন্ধকারে;
কার সে গভীর দীর্ঘ দুঃখের শোকানলে মাটি মানুষ আকাশ কাঁদে বারো মাসই।
স্বজনহারার সন্তাপে যে থমকে দাঁড়ায় সপ্তসায়র, কে সে তিনি; কি নাম তাহার;
মানবতার পরম আপন কল্যাণীয়া-সারাটাকাল পিতার মহান আদর্শেতে
যার মানবিক মনোলোকে ভালোবাসার অমর গীতি বাজতে থাকে বিশ্বজয়ের।
দিন বদলের অভিযানে ভয়কে জয়ের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে জানান দিলেন
দুখিজনের মলিন মুখে গোলাপ হাসি ফোটার আশয় প্রাণের ভাষায় লড়বো আমি।
জীবন মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সে যে বিশ্বসভায় উদ্যতশির বীরগরিমায়
দুঃসাহসী উচ্চারণে বিশ্ববিবেক বিস্মিত হয় মানবতার গভীর গানে।
কার ললাটে মানবপ্রেমের সৌভাগ্যের পরশ পাথর খচিত হয় অমন করে?
শতো বাধার ভয়ংকরী আঁধার কেটে যায় এগিয়ে মহৎ মহান সাধনাতে,
শোকানলে শঙ্কিত মন রক্তাক্ত উপত্যকায় সাহস যোগায় মানুষ মনে।
কার চোখেরই শ্রাবণধারায় অত্যাচারী হন্তারকরা খড়গ হাঁকায় প্রাণ বিনাশের!
জীবনটাকে তুচ্ছ ভেবে মানবতার মুক্তির আরাধনায় তিনি দেশ-বিদেশে
উড়ে ঘুরে দীপ্ত শপথ পাঠে একা এগিয়ে চলেন অতন্দ্রপ্রহরী বেশে।
ষড়যন্ত্র-সংকটেরই অবক্ষয়ের অন্ধকারে, মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে
বলেন তিনি, পিতার মহান আদর্শেতে এ দেশটাকে গড়ব আমি সোনার বাংলায়।
বন্যদস্যু দানবীয় গুপ্তঘাতক খোড়ায় কি আর কাউকে আমি কেয়ার করি;
আমার চেয়ে কে আর বেশি হারিয়েছে প্রাণের স্বজন পরম আপন বলতে পারো?
তাঁর শুভ এই জন্মদিনে আকাশ হাসুক, বাতাস নাচুক চতুর্দিকে মহানন্দে
শান্তিময় সমাধানের অগ্রগামী অবিনশ্বর গান শোনালে ঘরে ঘরে,
স্থলসীমান্ত, সমুদ্রসীমা মীসাংসাতে তাঁর অবদান গৌরবোজ্জ্বল গর্বগাথায়
অর্ধচেতন ভোরের পাখি জেগে ওঠে আজ সারাদিন হাসি-খুশি জয়োল্লাসে।
তেজোদীপ্ত কণ্ঠে তিনি অঙ্গীকার ঘোষণা করেন, উদ্দীপক সে উচ্চারণে
তাঁর দৃঢ়তায়-শোককে আমরা শক্তি ভেবে স্বদেশপ্রেমে প্রজ্বলিত সোপান গড়ি।
বিশ্বনেতা দেশরত্নের জন্মদিনে মেঘলাকাশে চন্দ্র হাসুক, পায়রা নাচুক,
রাষ্ট্রনায়ক-আপনাকে আজ লাল সালাম, হাসি গানে বেজে উঠুক জয়োধ্বনি।
বিপ্লবী যার কণ্ঠে বাজে অগ্রগতির প্রতিধ্বনি ক্ষুধামুক্ত এদেশ গড়ার,
জগজ্জয়ী জ্যোতি ছড়ান বীর বাঙালির মানসমাঠে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির সুরে।
আলোক আঁধার বনবনানীর শীতল ছায়ায় দেশে দেশে সব লোকালয় সুখ-আনন্দে
পদ্মা- মেঘনা জলপ্রপাতে-নীল পাথারে ঊর্মিমালায় খুশির বানে ভাসুক সবাই।
ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে তিনি এ জাতিকে স্বপ্ন দেখান অপরিসীম জ্যোৎস্না আভায়
অমাবস্যার ঘোর আঁধারে আলোকিত আগামীরই জড়োয়া সম্ভারে একা
মহীয়সী মনীষা যে সম্ভাবনার গান শোনালেন সোনার বাংলা বিনির্মাণে,
তার শোকানল-গর্বগাথায় মহাকাব্যের দারুণ স্বপ্নে দিনের মাঝে দিন ফুরালো।
মধ্যশরৎ সুপ্রভাতে কাশফুলেরই ঢেউয়ের তালে মধুমতির জলপায়রা
আনন্দেতে উঠবে হেসে, কলমি ডগায় নাচবে ডাহুক আটাশ সেপ্টেম্বরের শুভ
জন্মভূমির পরম আপন বীর জননীর জন্মদিনে সব বিভাজন বিভেদ ভুলে
পূর্ণিমারই আলোর রথে আনন্দেরই ঝরনাধারায় উঠবো জেগে প্রাণের টানে।

উচ্চ মাত্রায় এফডিআই আহরণ এখন সময়ের দাবি

এম এ খালেক

অর্থনীতির বেশিরভাগ সূচক ইতিবাচক ধারায় প্রবহমান থাকার ফলে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চ মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সমর্থ হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশের মর্যাদা লাভ করবে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা পূর্বাভাস দিয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশ গত কয়েক বছরে উচ্চ মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে তারা মনে করছে। তারা আরো বলেছে, এই উচ্চ মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের পেছনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে দেশটির শিল্প ও সেবা খাত। মূলত এই দুটি খাতের গতিশীলতার কারণেই প্রবৃদ্ধির হার এতটা উচ্চ মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। আগামীতেও বাংলাদেশ স্থিতিশীলভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সরকার ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আহরণের ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সরকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয় না। বরং সরকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। সেই বিনিয়োগ পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করেন। যেমন, পদ্মা নদীর উপর দিয়ে তৈরি হচ্ছে আমাদের জাতির বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের পদ্ম সেতু। এই পদ্মা সেতু সরাসরি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তেমন একটা অবদান রাখবে না কিন্তু পদ্মা সেতু ব্যবহার করে দেশে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। এই সেতুর সুবিধা ব্যবহার করে একের পর এক শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে থাকবে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোর সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। স্থানীয় এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা পদ্মা সেতু ব্যবহার করে তাদের শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে পারবে এবং সেই শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্য খুব সহজেই রাজধানীতে সরবরাহ করতে পারবে। এমনকি বিদেশেও রফতানি করতে পারবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার প্রতিবছরই বড়ো হচ্ছে। সেই তুলনায় বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়ছে। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। গত বছর সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আহরণের ক্ষেত্রে বিশ্বের ৪৭টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার সবার শীর্ষে রয়েছে। মিয়ানমার বাংলাদেশের সমপরিমাণ এফডিআই আহরণ করলেও তাদের এফডিআই-এর পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় ১৮ দশমিক ১ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এফডিআই আগের বছরের চেয়ে ৬৮ শতাংশ বেড়েছে। ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আঙ্কটাড)-এর ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট, ২০১৯-এ এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টে আরো বলা হয়, ২০১৮ সালে সার্বিকভাবে বিশ্ব এফডিআই-এর পরিমাণ ১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দেড় লাখ কোটি মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। তবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫ শতাংশ বেড়েছে। তাদের আহরিত মোট সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার প্রত্যেকেই ৩৬০ কোটি মার্কিন ডলার করে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর আহরিত এফডিআই বেড়েছে ৪ শতাংশ। মোট পরিমাণ ছিল ৫ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত এবং শ্রীলঙ্কার এফডিআই বৃদ্ধি পেলেও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা ২৫ শতাংশ কমেছে। বিশ্বের ৪৭টি স্বল্পোন্নত দেশে ১০০ কোটি মানুষ বাস করলেও তারা বৈশ্বিক পুঁজির মাত্র ৩ শতাংশ পাচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলো সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ যতটা আহরণ করতে পারছে তার চেয়ে অনেক বেশি পাচ্ছে রেমিটেন্স। এসব দেশ গত বছর মোট ২ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ পেলেও তারা রেমিটেন্স আহরণ করেছে ৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। ২০১৮ সালে সামগ্রিকভাবে বৈশ্বিক বিনিয়োগ হ্রাস পাবার অন্যতম কারণ হিসেবে মার্কিন বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ প্রত্যাহারকে দায়ী করা হয়েছে। ২০১৭ সালে ব্যাপকভাবে মার্কিন কর ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করা হয়। ফলে সে দেশের বিনিয়োগকারীরা বিদেশে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে অনেকটাই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, তারা বিদেশে বিনিয়োজিত পুঁজি প্রত্যাহার করে নিজ দেশে নিয়ে আসতে শুরু করে।

২০১৮ সালে বাংলাদেশে যে রেকর্ড পরিমাণ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আহরিত হয়েছে এর মূল কারণ হচ্ছে, বিদ্যুৎ এবং তৈরি পোশাক সেক্টরে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ পেয়েছে। এছাড়া জাপান টোব্যাকো কোম্পানি বাংলাদেশের ইউনাইটেড টোব্যাকো কোম্পানিকে ১৫০ কোটি মার্কিন ডলারে অধিগ্রহণ করেছে। ফলে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের এফডিআই-এর পরিমাণ বেড়েছে। চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ এশীয় কয়েকটি দেশে শ্রমিকের মজুরি সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির কারণে ঐ সব দেশের শিল্পোদ্যোক্তাদের অনেকেই তাদের শিল্পকারখানা বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশে

স্থানান্তরের চিন্তা-ভাবনা করছেন। এটা করা হলে আগামীতে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ আহরণে সক্ষম হবে। নিকট অতীতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটাই স্থিতিশীল থাকার কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এছাড়া সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজির পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে।

উন্নত বিশ্বের উদ্বৃত্ত পুঁজির মালিকগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগের পেছনে কারণ রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার গেটওয়ে হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের মাধ্যমে চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশে পণ্য ও সেবা রফতানি করা যায়। বাংলাদেশে রয়েছে ১৭ কোটি মানুষের এক বিশাল বাজার। উন্নত বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে তিনটি/চারটি দেশ মিলেও ১৭ কোটি মানুষ নেই। বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের ভোগ ব্যয় এবং ভোগ করার জন্য অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্য উভয়ই বেড়েছে। এই সামর্থ্য বা ভোগ চাহিদা পূরণের জন্য উন্নত দেশের বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিচ্ছে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের অনেক দেশ থেকেই শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পেয়ে থাকে। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে পণ্য ও সেবা রফতানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত জিএসপি সুবিধা প্রদান করে থাকে। এই সুবিধার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৬টি দেশে বাংলাদেশি পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শুল্ক দিতে হয় না। কানাডার একজন উদ্যোক্তা যদি তার দেশে পণ্য উৎপাদন করে তাহলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো দেশে সেই পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে জিএসপি সুবিধা পাবে না। কিন্তু সেই একই কোম্পানি যদি বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো দেশে রফতানি করে তাহলে তাকে কোনো শুল্ক প্রদান করতে হবে না। বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে যারা এখন অভ্যন্তরীণ অথবা দ্বিপাক্ষিক সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। সেই সব দেশে কোনো বিদেশি বিনিয়োগকারী যাবে না। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে চমৎকার এক ব্যতিক্রম। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণভাবে কোনো জাতিগত সংঘাত নেই। বাংলাদেশ তার কোনো প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেও বিবাদে লিপ্ত নেই। বাংলাদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে একজন বিদেশি উদ্যোক্তা নানাভাবে উপকৃত হতে পারছেন। বাংলাদেশে আগত বিদেশি বিনিয়োগকারীদের স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের মতোই সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তারা চাইলে স্থানীয় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারছেন। তারা অর্জিত মুনাফা তাদের দেশে প্রত্যর্পণ করতে পারছেন। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নানাভাবে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে নিজস্ব মালিকানাধীনে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। সরকার নানাভাবে শিল্পকারখানা স্থাপনের উপযোগী অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করছে। মালয়েশিয়ার অনুকরণে বিনিয়োগ আহরণের জন্য বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) গঠন করা হয়েছে। বিডা বিনিয়োগকারীদের জন্য কার্যকর 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগ কার্যকর হলে বিনিয়োগকারীরা একই ছাদের নিচে অন্তত ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সেবা পেতে পারবেন। আশা করা হচ্ছে, আগামীতে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যাবে।

গত বছর বাংলাদেশ যে রেকর্ড পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ আহরণ করেছে এটা অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে ৩৬০ কোটি মার্কিন ডলার সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আহরণ করা সরকারের বড়ো অর্জন। কারণ আঙ্কটাড যে বিনিয়োগ প্রতিবেদন প্রকাশ করে তা ক্যাশ ট্রান্সফারের ভিত্তিতে প্রণীত অর্থাৎ এটা প্রকৃত বা বাস্তব বিনিয়োগ।

স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ আহরণের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার, বিশেষ করে সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান সরকার অব্যাহতভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন রয়েছেন। একটি সরকারের ধারাবাহিকতার ওপর বিনিয়োগ আহরণ অনেকটাই নির্ভর করে। কারণ ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হলে আমাদের মতো দেশে নীতিমালাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে বিনিয়োগকারীরা সেই দেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে আস্থাহীনতায় ভোগে। বর্তমান সরকার ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার ফলে তারা স্থিতিশীল বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমর্থ হচ্ছে। এটা বিনিয়োগ আহরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখনই কোনো দেশ সফরে গিয়েছেন তিনি স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের নিকট বাংলাদেশের চমৎকার বিনিয়োগ পরিবেশের বিষয়টি তুলে ধরে বাংলাদেশে বর্ধিত হারে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক চীন সফরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ১লা জুলাই থেকে ৫দিন ব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফরে চীন গমন করেন। সেখানে দ্বিপাক্ষিক অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেন। প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর এবং সেখানকার বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানানোর বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী। কারণ চীন বাংলাদেশের একটি বড়ো অর্থনৈতিক অংশীদার। বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিরোধের কারণে মার্কিন বাজারে চীনা পণ্য রফতানির সুযোগ অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় চীনা বিনিয়োগকারীরা তাদের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার ইত্যাদি প্রতিবেশী দেশগুলোতে তাদের শিল্পকারখানা স্থানান্তরের চিন্তা-ভাবনা করছেন। এছাড়া চীনের নতুন বিনিয়োগকারীরাও বাংলাদেশ বা এ ধরনের দেশে তাদের বিনিয়োগ নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কাজেই এই অবস্থায় বাংলাদেশকে তারা বিনিয়োগের জন্য উত্তম স্থান হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। গত ৫ অর্থবছরে চীনা বিনিয়োগকারীরা ৮১০ কোটি ৭৩ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে বাংলাদেশে। আগামীতে এই বিনিয়োগ আরো বৃদ্ধি পাবে এটা নিশ্চিত করেই বলা যেতে পারে। চীনা সরকার বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরো সহজীকরণ করার উদ্দেশ্যে সরকার নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের মতোই সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। সরকারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে আগামীতে দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চমৎকার সাফল্য অর্জিত হবে নিঃসন্দেহে।

লেখক: অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক ও মহাব্যবস্থাপক (অব.) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

প্রথম মুসলিম সবাক চিত্র নায়িকা রাণী যোবায়দা

অনুপম হায়াৎ

১৯৩১ সালের মার্চ মাস। উপমহাদেশের দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে দেখল নায়িকাদের মুখে কথার কলি ফুটছে। কবি নজরুলের ভাষায় এ যেন 'আধো আধো বোল বাজে...'। পর্দালোকের স্বপ্নের রাণীরা এদ্দিন ধরে শুধু শারীরিক রূপ-লাবণ্য ও যৌবনের বিস্তার দিয়ে বিলোল কটাক্ষ হেনে মোহময় চপল নৃত্য দিয়ে কামরাঙা ঠোঁটে বোবা হয়ে কেবলি আকুলি-ব্যাকুলি করতো, সেই রাণীদের কিন্নর কণ্ঠ সরব হলো প্রথম। কোটি কোটি দর্শক অবাক হয়ে সবাক সুন্দরীদের দেখে এবং শুনে আবেগে নির্বাক হয়ে গেল। সেই অবাক করা প্রথম সবাক ছবি 'আলম আরা'র নায়িকা যোবায়দা ১৯৮৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর চিরদিনের মত নির্বাক হয়ে পরপারে চলে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। এই উপমহাদেশের প্রথম বায়োস্কোপ দেখানো হয় ১৮৯৬ সালে বোম্বের ওয়াটসন হোটেলে আর ঢাকার মানিকগঞ্জের হীরালাল সেন উপমহাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন ১৯০১-০২ সালের দিকে। ১৯১৩ সালে ডি.জি. ফালকে তৈরি করেন উপমহাদেশের প্রথম কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশ চন্দ্র'। ১৯৩১ সালে আরদেশির ইরানি তৈরি করেন প্রথম সবাকচিত্র 'আলম আরা'। ছবিতে অন্যান্যের মধ্যে অভিনয় করেন পৃথিরাজ, মাস্টার ভিতল, জগদীশ শেঠী, জিল্লোবাই, ডবলিউ এম খান প্রমুখ।

ইতিহাস সৃষ্টিকারী 'আলম আরা'র নায়িকা যোবায়দার জন্ম ১৯১২ সালে সুরাটে। তার পিতার নাম সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব খান আর মা'র নাম ফাতেমা বেগম। মা ফাতেমা ১২ বছরের যোবায়দাকে নিয়ে বোম্বে পাড়ি দেন। ফাতেমা বেগম ছিলেন সেকালের বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী। তাঁর ছিল রূপ-লাবণ্যের খ্যাতিও। মায়ের রূপ-লাবণ্য পেয়েছিলেন মেয়ে যোবায়দাও। ফাতেমা সিদ্ধান্ত নিলেন মেয়ে যোবায়দাকে অভিনেত্রী বানাবেন।

মায়ের উদ্যোগে যোবায়দা ১২ বছর বয়সেই প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত প্রথম নির্বাক ছবির নাম 'গুলে বাকাওলী'। এরপর থেকে স্টুডিও হয়ে ওঠে যোবায়দার বিচরণ ক্ষেত্র, ক্যামেরা হয়ে ওঠে বন্ধু। তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য আর অভিনয় দক্ষতার কারণে বাড়তে থাকে ছবির সংখ্যা। তিনি অভিনয় করেন নির্বাক ৩৬টি ও সবাক ২০টি চলচ্চিত্রে। 'পাপের পরিণাম' ছিল তাঁর অভিনীত শেষ নির্বাক ছবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে 'বীর অভিম্যণু' (১৯২২), 'গুলে বাকাওয়ালী' (১৯২৪), 'কল্যাণ খাজিনা' (১৯২৪), 'কালনাগ' (১৯২৪), 'পৃথ্বি বল্লভ' (১৯২৪), 'কালাচোর' (১৯২৫), 'দেবদাসী' (১৯২৫), 'দেশ কা দুশমন' (১৯২৫), 'ইন্দসভা' (১৯২৫), 'অবলা নারী' (১৯২৬), 'বুলবুল পরীস্থান' (১৯২৬), 'লায়লা মজনু' (১৯২৭) ইত্যাদি ছবি।

১৯৩০ সালের শেষ দিকে আরদেশির ইরানি সবাক 'আলম আরা' ছবি নির্মাণের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেন। এ ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি নায়িকা হিসেবে যোবায়দাকে নির্বাচিত করেন। উপমহাদেশের প্রথম সবাক ছবি 'আলম আরা' মুক্তি পেয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে, সেই সঙ্গে যোবায়দাও ইতিহাস সৃষ্টি করেন, প্রথম 'সবাক সুন্দরী' হয়ে। আলম আরা'র পর যোবায়দা আরো ২০টি সবাক ছবিতে অভিনয় করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মীরাবাঈ, বিসর্জন, মা। মীরাবাঈ ছবিতে তিনি ২৩টি গান গেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যোবায়দা ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণির গায়িকাও। যোবায়দা পরে প্রযোজিকা হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'মহালক্ষ্মী সিনেটোন'। এই প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি রাজা ধনরাজগিরির সংস্পর্শে আসেন। পরে দু'জন প্রেমে পড়ে বিয়ে করেন। ধনরাজগিরির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল বারো বছর বয়স থেকেই। যোবায়দা অভিনীত সর্বশেষ সবাক ছবি ছিল 'মা' (১৯৩৬)।

খ্যাতির শিখরে থাকতে থাকতে তিনি চিত্রজগত থেকে বিদায় নেন। নির্বাক ও সবাক যুগে দর্শক চিত্তজয়ী রাণী যোবায়দার শেষ বছরগুলো কেটেছে নির্জন পারিবারিক পরিবেশে নানা অসুস্থতায়। এক ছেলে ও এক মেয়ের মা যোবায়দা বহুমূত্র, শ্বাসকষ্ট ও বাতে ভুগছিলেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। যোবায়দার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটতো বই পড়ে, শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করে। সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে আর অতীতের স্মৃতিচারণ করে।

একবার সোসাইটি পত্রিকার সাক্ষাৎকারে ১৯৮৫ সালে তিনি বলেছিলেন 'আমি যদি আজকে চিত্রজগতে থাকতাম তাহলে আমি রাজকাপুর পরিচালিত ছবির নায়িকা হতেই পছন্দ করতাম'। আমার মতে রাজকাপুর হচ্ছেন একজন চমৎকার পরিচালক। উল্লেখ্য, রাজকাপুর গত জুনের (১৯৮৫) প্রথম সপ্তাহে মারা গেছেন।

উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্রের নির্বাক ও সবাক যুগে মুসলিম অভিনেত্রী হিসেবে যোবায়দার উপস্থিতি ছিল যেমন সাহসিকতাপূর্ণ তেমন গুরুত্বপূর্ণও। যোবায়দার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক জীবনের সমাপ্তি ঘটল।

যোবায়দার মৃত্যুর সংবাদে ঢাকা তথা বাংলাদেশের অনেক প্রবীণ দর্শকও আবেগে আপ্লুত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। যোবায়দা অভিনীত উপমহাদেশের প্রথম সবাক চিত্র 'আলম আরা' ঢাকার লায়ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। এর পরিবেশক ছিলেন এফ এ দোসানী।

যে 'আলম আরা' ছবির জন্য যোবায়দা ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছেন সে ছবিতে তাঁর ভূমিকা ছিল সেনাপতির আদুরে কন্যার। সুন্দরী তরুণী সে কন্যা ভালোবেসেছিল এক রাজপুত্রকে। রাজার ছিল দুই রাণী। একজন খারাপ আরেকজন ভালো। যোবায়দা ভালোবেসেছিল ওই ভালো মায়ের পুত্রকে। অতঃপর তারা সুখে কাল কাটিয়েছিল আর সেই সঙ্গে যোবায়দা পেয়েছিলেন প্রথম মুসলিম 'সবাক নায়িকা'র সম্মানও।

লেখক: সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র সমালোচক

নিবন্ধ

জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় ১৫ প্রস্তাবে ইউএন-এর সম্মতি প্রসঙ্গে

মোতাহার হোসেন

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। তবে বর্তমানে এই ছয় ঋতুর অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। শীত, বর্ষা আর বসন্ত ঋতুর অনুভব করা যায় খুব সামান্য সময়ের জন্য। প্রকৃতির এই বৈরী খেলায় বিপন্ন হচ্ছে মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং জীবনাচার। প্রকৃতির এই বৈরী খেলাকে পরিবেশবিদ, পরিবেশ বিজ্ঞানী, জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আমাদের ঋতুচক্রে, তথা ঋতু পরিক্রমায় পরিবর্তন ঘটেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ শীর্ষে।

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা বায়ুমণ্ডল ক্রমাগত উত্তপ্ত হওয়ায় বরফাচ্ছাদিত হিমালয়সহ বরফের চাদরে আচ্ছাদিত এন্টার্কটিকা অঞ্চলের বরফও গলছে খুব দ্রুততার সাথে। সেই সঙ্গে বাড়ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা। শুধু বাংলাদেশে আগামী ৫০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্র উপকূলে বসবাসরত প্রায় ৩ কোটি মানুষ বসত বাড়ি হারা হবে এমন আশঙ্কা বিজ্ঞানীদের। পাশাপাশি জোয়ার ভাটা, পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদী ভাঙনের তীব্রতা বাড়বে।

এমনি অবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতি ও ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে গঠন করেছে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড, প্রণয়ন করেছে ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান। এই অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করছে গত ১ বছর ধরে। পাশাপাশি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান সংশোধন করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের এই কর্মসূচি ও উদ্যোগ বিশ্ব পরিমণ্ডলে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা 'ইউএনইপি 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এ কারণেই বাংলাদেশকে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় 'রোল মডেল' হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। এমনি এক সময়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রদত্ত ১৫ দফা দাবি তথা সুপারিশ জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। এ সুপারিশসমূহ নিয়ে জেনেভায় মানবাধিকার পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের শেষ দিনে ভোটাভোটি পর্বে বাংলাদেশের প্রস্তাবটির ব্যাপারে কোনো দেশ আপত্তি জানায়নি। এরপর অধিবেশনের সভাপতি সবার সম্মতির ভিত্তিতে ভোট ছাড়াই প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার ঘোষণা দেন।

এর আগে সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও জেনেভায় জাতিসংঘের দপ্তরগুলোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এম শামীম আহসান জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার ইস্যুতে প্রস্তাবটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি জানান, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম প্রস্তাবটির পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এছাড়া ৪৩টি রাষ্ট্র এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। পাকিস্তান ও ফিজির প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশের প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সাধুবাদ জানান। ডেনমার্কের প্রতিনিধি আশা করেন, সব রাষ্ট্র নিজ নিজ অবস্থানে থেকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভূমিকা রাখবে এবং মানবাধিকারের প্রতি সব রাষ্ট্রই সম্মান দেখাবে।

জেনেভা থেকে পাওয়া খবরের উদ্ধৃতি থেকে বাংলাদেশের পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, গৃহীত প্রস্তাবটিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ধীরে ধীরে সংঘটিত বিপর্যয় এবং সব ধরনের মানবাধিকার চর্চার ওপর এসব বিপর্যয়ের বিরূপ প্রভাবের ব্যাপারে উদ্বেগ জানানো হয়েছে। বিশেষ করে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ও তাদের জনগণের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে প্রস্তাবে। এর তৃতীয় দফায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের কাঠামোর আলোকে মানবাধিকারসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করতে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান রয়েছে।

চতুর্থ দফায় 'ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিট' আয়োজনে জাতিসংঘ মহাসচিবকে সহায়তা করতে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রকে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন নীতি প্রণয়নে ব্যাপক পরিসরে, সমন্বিত, জেন্ডার সংবেদনশীল ও প্রতিবন্ধীবান্ধব উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানানো হয়েছে পঞ্চম দফায়। প্রস্তাবের ষষ্ঠ দফায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব পড়েছে এমন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে মানবাধিকার এবং প্রতিবন্ধীদের জীবিকা, খাদ্য ও পুষ্টি, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সেবা উৎসাহিত করতে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে আহ্বান জানানো হয়েছে। সপ্তম দফায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে বলা হয়েছে। মানবাধিকার পরিষদের ৪৪তম অধিবেশনে 'জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধীদের অধিকার উৎসাহিতকরণ ও সুরক্ষা' শীর্ষক আলোচনা ও কর্মসূচি নির্ধারণের আহ্বান জানানো হয়েছে প্রস্তাবের অষ্টম দফায়। ওই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মানবাধিকার পরিষদের ৪৬তম অধিবেশনে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারকে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে প্রস্তাবের নবম দফায়। দশম দফায় জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিশেষ দূতদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি ও মানবাধিকার পরিষদে উপস্থাপন করতে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের প্যানেল আলোচনায় শিক্ষাবিদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টদের আমন্ত্রণ জানাতে বলা হয়েছে একাদশ দফায়। প্রস্তাবের পরবর্তী দফাগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার ইস্যুতে জাতিসংঘ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘ মহাসচিব ও মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারকে প্যানেল আলোচনা ও প্রতিবেদন তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার পরিষদকে জানিয়েছে, এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ অন্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে। গৃহীত প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে জাতিসংঘের বাড়তি দুই লাখ ৩০ হাজার ৪০০ মার্কিন ডলার খরচ হবে। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে– ইউএন-এর মানবাধিকার পরিষদে বাংলাদেশের প্রদত্ত ১৫ প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গৃহীত হওয়ায় জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের ঝুঁকি মোকাবিলায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উন্নত ও শিল্পোন্নত দেশসমূহের কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। পাশাপাশি বিশ্ব দরবারে আবারো স্বীকৃতি পেল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণে বাংলাদেশের দাবি, প্রস্তাব ও সুপরিশসমূহ যৌক্তিক।

লেখক: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট, সাংবাদিক ও সাধারণ সম্পাদক, বিসিজেএফ

হায়! হোসেন

সাদিয়া সুলতানা

১০ই মহররম ইমাম হোসেন (রা.) এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের করুণ এবং হৃদয়বিদারক মৃত্যু কলঙ্কিত করে কারবালার মরুভূমিকে। হিজরি সাল বা আরবি নতুন বছরের প্রথম মাস মহররম। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং ধর্মের লোকেরা নতুন বছরের নতুন মাসকে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে। অথচ মুসলমানদের মাঝে আরবি বছরের প্রথম মাস মহররম যা শোকের স্মৃতি নিয়ে উপস্থিত হয়।

মহররম মাসের ১০ তারিখে হিজরি ৬১ সাল বা ১০ই অক্টোবর ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান ইরাকের কারবালার মরুভূমিতে হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ইসলামের সর্বশেষ নবি হজরত মোহাম্মদ (স.)-এর প্রিয় নাতি এবং হজরত আলী (রা.) ও মা ফাতেমা (রা.)-এর সন্তান হজরত ইমাম হোসেন (রা.) সহ তাঁর পরিবার ও গোত্রের ৭২ জন সদস্য। তাই নতুন বছর মুসলমানদের জন্য নিয়ে আসে শোকবার্তা এবং জাগ্রত করে শোক স্মৃতি।

একসময় মুসলমানদের ঐক্যের কথা বিবেচনা করে ইমাম হাসান (রা.) মুয়াবিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তির ফলে সবাই ধারণা করেছিলেন আরব বিশ্ব শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হবে। কিন্তু বাস্তব বড়োই নির্মম। এই চুক্তি পরবর্তীতে রাজতন্ত্রের সূচনা করে। হজরত আলী (রা.)-এর মৃত্যুর পর কুফাবাসীর কিছু জনগণ হজরত আলী (রা.)-এর বড়ো পুত্র ইমাম হাসান (রা.)-কে মুসলমানদের নেতা ঘোষণা করে। সেনাপতি মুয়াবিয়ার হাতে ছিল মিসর, সিরিয়া, সাইপ্রাস, তুরস্কসহ একটি বিরাট অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ। তিনি ইমাম হাসান (রা.)-এর নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেননি। তিনি নিজেই নিজেকে মুসলমানদের নেতা ঘোষণা করেন। ইমাম হাসান (রা.)-এর পক্ষের অনেককেই ভয়ভীতি, প্রলোভন, কূটনীতি ও অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে নিজ দলে নিয়ে আসে মুয়াবিয়া। ঠিক তখনই মুসলমানদের ঐক্যের কথা বিবেচনা করে মুয়াবিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেন। চুক্তির শর্ত ছিল যে, মুসলমানদের শাসনে কোনো পরিবারতন্ত্র করবেন না। কিন্তু মুয়াবিয়ার চক্রান্তে ইমাম হাসান (রা.) কে রাজনীতি থেকে এক প্রকার বিতাড়িত করেন। ইমাম হাসান (রা.)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। কে বিষ প্রয়োগ করে তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বির্তক রয়েছে। গবেষকরা বিষ প্রয়োগকারী হিসেবে তাঁর স্ত্রীর নাম প্রকাশ করলেও তা অনুমানভিত্তিক। এর স্বপক্ষে কোনো তথ্য প্রমাণ নেই।

ইমাম হাসানের মৃত্যুর পর হজরত হোসেন (রা.)-কে কুফায় আমন্ত্রণ জানান এবং মুসলিম বিশ্বের হাল ধরার জন্য তাঁর অনুসারীরা তাঁকে প্রস্তাব করেন। উল্লেখ্য, কুফাবাসীদের মধ্যে কতিপয় জনগণ মুয়াবিয়ার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবে মুয়াবিয়ার জীবিত থাকা অবস্থায় হোসেন (রা.) এই প্রস্তাবে রাজি হন নাই।

মুয়াবিয়ার ইন্তেকালের পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার পুত্র এজিদ হবে মুসলিম বিশ্বের নেতা। পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল চার খলিফার বংশধর। সিরিয়ার দামেস্কে এক সম্মেলন ডেকে মুয়াবিয়া মুসলমান বিশ্বের সমর্থন কামনা করে। মদিনার জনগণ মুয়াবিয়াকে সমর্থন না করলেও মক্কাবাসীরা মুয়াবিয়াকে সমর্থন দেন। পরবর্তীতে মদিনার একটি বড়ো অংশের জনগণ এজিদকে মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসেবে মেনে নেয়।

তৎকালীন সময়ে কিছু সংখ্যক জনগণের সমর্থন পেয়ে এজিদ হোসেন (রা.)-কে আনুগত্য স্বীকারের জন্য প্রস্তাব পাঠায়। হোসেন (রা.) এই আনুগত্য স্বীকারে সম্মত হলেন না। মদিনার জনৈক নেতা ছিলেন মুয়াবিয়া পুত্র এজিদে আনুগত্য। হোসেন (রা.)-কে হত্যার হুমকি দিলে ইমাম হোসেন(রা.) মদিনা ছেড়ে মক্কায় চলে যান (৬৭৫) সাল। ইরাকের কুফা নগরীর জনগণ ছিলেন এজিদবিরোধী। তাঁরা ইমাম হোসেন (রা.)-কে কুফায় আসার আমন্ত্রণ জানান। এই খবর এজিদের কানে পৌঁছুলে সে ক্রোধে ফেটে পড়ে। কুফার শাসক ছিলেন– নোমান বিন বাশির। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার স্থলে বসরার শাসক ওবায়দুল্লা ইবনে জিয়াদকে নিয়োগ দেয়। নিয়োগ পেয়েই কুফায় বসবাসরত এজিদবিরোধীদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। কতককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। দুঃখের বিষয় এ বিষয়টি ছিল ইমাম হোসেন (রা.)-এর অজানা। তিনি পরিবার-আত্মীয়স্বজন ও অনুসারীদের নিয়ে কুফা গমনের পরিকল্পনা করেন।

কুফা গমনের পূর্বে ইমাম হোসেন (রা.) মক্কায় পাঁচ মাস অবস্থান করেন। হজের ঠিক একদিন পূর্বে অর্থাৎ হিজরি ৬০ সালেন ৮ জিলকদ তারিখে (৯ই সেপ্টেম্বর ৬৮০) তাঁর পরিবার ও প্রায় ৫০ জন সঙ্গী নিয়ে ইরাকের কুফার দিকে যাত্রা করেন। কুফার তালাবিয়া নামক স্থানে ইমাম হোসেন (রা.) পৌঁছুলে কুফায় প্রেরিত দূত ও চাচাতো ভাই মুসলিমকে হত্যার খবর পান তিনি। ইমাম হোসেন (রা.) খুবই মর্মাহত হন। তিনি কুফাবাসীর গৃহবিবাদের বিষয়টি ভালোভাবে অবগত হন। তিনি দূত ও চাচাতো ভাই মুসলিমের হত্যায় প্রতিশোধ নিতে কুফার দিকে এগিয়ে যান।

জুবালা নামক স্থানে পৌঁছুলে ইমাম হোসেন (রা.) কুফায় প্রেরিত আর একজন দূতকে হত্যার খবর পান। পরিস্থিতি অনুধাবন করে ইমাম হোসেন (রা.) সঙ্গীদের নিরাপদ স্থানে চলে যাবার আদেশ দেন। পথে কিছু মুসলমান হোসেন (রা.)-এর সঙ্গে যোগ দেয় এবং মক্কা থেকে আগত সঙ্গীরা ইমাম হোসেন (রা.)-এর সঙ্গে থেকে যান। কুদসিয়া নামক স্থানে হোসেন (রা.)-এর কাফেলাকে বাঁধা দেয় এজিদবাহিনী। সৈন্যদের কুফাবাসীর আমন্ত্রণপত্র দেখানো হয় কিন্তু সৈন্যরা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং ইমাম হোসেন (রা.)-কে তাদের সঙ্গে ওই অঞ্চলের শাসক ইবনে জিয়াদের কাছে যেতে বলে। ইমাম হোসেন (রা.)-এর কাফেলাকে কুফা বা মক্কা বাদে অন্য কোথায় যেতে অনুমতি দেয়।

তখন ইমাম হোসেন (রা.)-এর কাফেলা কুদসিয়া নামক স্থানের দিকে যাত্রা করে। কাফেলা অনুসরণ করে এজিদবাহিনী। স্থানীয় শাসক ইবনে জিয়াদের আদেশে জনবসতি থেকে দূরে ও পানির উৎসবিহীন স্থানে সরে যেতে বাধ্য করে। এর ফলে ইমাম হোসেন (রা.) কুফা থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে এক নির্জন মরুভূমিতে তাঁবু স্থাপনে বাধ্য হন। ইতিহাসের পাতায় এই স্থানটি 'কারবালা' নামে বহুল পরিচিত।

শুরু হয় কারবালার যুদ্ধ। একদিকে ন্যায়ের পক্ষে ইমাম হোসেন (রা.)-এর কাফেলা অন্যদিকে এজিদের অনুসারী ইবনে জিয়াদের সৈন্যরা। এজিদ সমর্থিত শত সৈন্য কারবালা এলাকা ঘিরে ফেলে। ইবনে জিয়াদ ইমাম হোসেন (রা.)-কে আত্মসমর্পণ করতে বলেন, অন্যথায় সৈন্যদের বল প্রয়োগের নির্দেশ দেয়। সে সময় পার্শ্ববর্তী ইউফ্রেটিস নদী তীরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। সে সময় সৈন্য বসিয়ে এজিদবাহিনী ইমাম হোসেন (রা.) ও তাঁর পরিবার ও সঙ্গী ৫০ জনকে তিনদিন পানিবিহীন অবস্থান করতে বাধ্য করে। ন্যায় ও আদর্শের পথে থাকা ইমাম হোসেন (রা.)-কে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানায়। এতেও হোসেন (রা.) টলানো গেল না। অতঃপর এজিদ সিমারকে নির্দেশ দেয় ইমাম হোসেন (রা.) হত্যা করা অথবা তাঁর দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার জন্য। ৯ই অক্টোবর ৬৮০ সাল তথা ৯ই মহররম ৬১ হিজরিতে সিমারের বিশাল সৈন্যদল ইমাম হোসেন (রা.)-এর কাফেলার কাছে অবস্থান নেন।

১০ই অক্টোবর ৬৮০ সাল বা ১০ই মহররম ৬১০ সাল। সকালে ফজরের নামাজ শেষে উভয় বাহিনী মুখোমুখী অবস্থান নেয়। ইমাম হোসেন (রা.) পক্ষে ছিল মাত্র ৩২টি ঘোড়া ও ৪০ জন পদাতিক যোদ্ধা। এ সংখ্যা কমবেশি হতে পারে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইমাম হোসেন (রা.) এক আবেগঘন বক্তৃতা দেন। এতে এজিদের অনেক সৈন্য ইমাম হোসেন (রা.)-এর দলে যোগদান করে। অবস্থা ইমাম হোসেনের পক্ষে যেতে পারে ভেবে এজিদবাহিনী যুদ্ধ শুরু করে। শত শত তীর নিক্ষেপ করে এজিদবাহিনী। অতঃপর শুরু হয় তরবারি যুদ্ধ। ইমাম হোসেন (রা.) অনেক সৈন্য নিহত হয়। থেমে থেমে যুদ্ধ চলে। চলে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ। ইমাম হোসেন (রা.)-এর

সৈন্যরা সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ ঠেকাতে সমর্থ হন। অশ্বারোহী বাহিনীও ছিল তৎপর। সে সময় ইবনে জিয়াদ ৫০০ তীরন্দাজকে আদেশ দেয় ইমাম হোসেনের বাহিনীকে ঠেকাতে। সৈন্যরা ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ইবনে জিয়াদ ইমাম হোসেনের কাফেলার তাঁবুতে আগুন লাগানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু এজিদবাহিনী ইমাম হোসেনের (রা.) ও তাঁর পরিবারের জন্য স্থাপিত তাঁবু বাদে সব তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেয়। যুদ্ধ চলে দিনভর। যুদ্ধ শেষে ইমাম হোসেন (রা.)-এর পুত্র আলী আকবরসহ তাঁর সঙ্গী, সাথি, আত্মীয়স্বজন প্রায় সবাই শাহাদতবরণ করেন। ইমাম হোসেন (রা.)-এর ছোটো সন্তান (আজগর) পানির জন্য অস্থির হয়ে পড়লে ইমাম হোসেন ও তাঁর সৎ ভাই আব্বাস পানির জন্য ছুটে যান নদীর দিকে। পথে তাদের আটকে দেয় এজিদবাহিনী। এসময় আব্বাসের কোলে থাকা ছোটো আজগরের গায়ে একটি তীর বিদ্ধ হলে তিনিও শাহাদতবরণ করেন।

পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে সৈন্যবাহিনী থেকে আলাদা হয়ে পড়েন ইমাম হোসেন (রা.)। এজিদবাহিনীর বিরাট সৈন্যদলকে মোকাবিলার তেমন শক্তি ছিল না ইমাম হোসেন (রা.) বাহিনীর। কোনো সৈন্যই ইমাম হোসেন (রা.)-কে সরাসরি আক্রমণে রাজি হলো না। এজিদের নির্দেশে একজন সৈন্য একটি তীর নিক্ষেপ করে ইমাম হোসেন (রা.)-কে তীরটি বিদ্ধ হয়েছিল মুখে। মুখ থেকে ঝরা রক্ত দুইহাতে তালুতে জমিয়ে হোসেন (রা.) তা আকাশের দিকে ছুড়ে দেন। তিনি তখন আল্লাহর দরবারে এই নৃশংসতার বিচার দাবি করেন। এতে এজিদ বাহিনী বিচলিত হয়ে পড়েন।

এজিদের বিশেষ ভক্ত ছিল এক পাষণ্ড ইবনে নুসাইয়ার। সে দ্বিতীয়বারের মতো আঘাত করে ইমাম হোসেন (রা.)-কে। আঘাতে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। মাথায় বাঁধা রক্তমাখা পাগড়ি নিয়ে পিছিয়ে যায় মালিক ইবনে নুসাইয়ার। সিমার এগিয়ে আসে এবং তার সৈন্যদের আঘাত করার নির্দেশ দেয়। ইমাম হোসেন (রা.)-কে বাঁচাতে তাঁর সঙ্গী, নারী ও শিশুরাও এগিয়ে আসে। একটি শিশু সে সময় তরবারির আঘাতে হাত হারায়। সৈন্যরা বিচলিত হয়ে পড়ে। সিমারের বিশেষ হিংস্র বাহিনী এগিয়ে যায় ইমাম হোসেন (রা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে। উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে তাঁকে। মাটিতে উপুর হয়ে পড়ে যান ইমাম হোসেন (রা.)। এসময় সিমারের নির্দেশে ইবনে আনাস নামের এক সৈন্য ছুরি দিয়ে ইমাম হোসেন (রা.)-কে আঘাত করে তাঁর মাথা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলে।

মাথা কেটেই ক্ষান্ত হয়নি সিমার। ইমাম হোসেন (রা.) মৃত দেহ ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে ঘোড়ার খুরের আঘাতে। ইমাম হোসেন (রা.)-এর বেঁচে থাকা কিছু সৈন্যকে কুফার শাসনকর্তা জিয়াদের কাছে পাঠানো হয়। সেইসঙ্গে পাঠানো হয় ইমাম হোসেন (রা.)-এর বিচ্ছিন্ন মাথা। ইবনে জিয়াদ হোসেন (রা.)-এর মাথার মুখে লাঠি ঢুকিয়ে দেয়।

কারবালার শহিদদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। একদল ঐতিহাসিক বলেন, পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী ইমাম হোসেন (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের মৃতদেহ কারবালাতেই কবরস্থ করেন। কবরস্থ শহিদদের অধিকাংশেরই শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, এজিদ ইমাম হোসেন (রা.)-এর বিচ্ছিন্ন মাথা কারবালায় ফেরত পাঠালে তা শরীরের সঙ্গে কবরস্থ করা হয়। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, মহররমের ১০ তারিখে শাহাদতবরণকারী ইমাম হোসেন (রা.)-এর পবিত্র মাথা ৪০ দিন পর কারবালায় পাঠানো হয় এবং দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করে পুনরায় কবরস্থ করা হয়। তাই শিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীরা আশুরা উপলক্ষে ৪০ দিন শোক পালন করে থাকে। আরবি আশারা শব্দের অর্থ ১০। এই আশারা থেকেই আশুরা শব্দটির উৎপত্তি। যা আজও অশ্রু ঝরায় মুসলমানদের চোখে। মহররমের ১০ তারিখে কারবালার মরুভূমিতে হৃদয়বিদারক ঘটনার সমার্থক হয়ে উঠে আশুরা শব্দটি।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

নিবন্ধ

বিশ্ব ওজোন দিবস

আনিকা তাবাসসুম

১৬ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব ওজোন দিবস। জনসাধারণের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের গুরুত্ব ও ওজোনস্তর সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'মন্ট্রিল প্রটোকল: ওজোনস্তর সুরক্ষার ৩২ বছর'।

মানুষ ও জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় ও ওজোন স্তরের অবদান অপরিসীম। কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য ওজোন স্তর দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু ওজোন স্তরের মধ্যে দিয়ে অতি সহজেই সূর্যের ক্ষতিকর আল্ট্রাভায়োলেট বি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পড়ে, ফলে মানুষের ত্বকে ক্যান্সার, চোখে ছানিসহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এর ফলে জলের এবং স্থলের গাছপালা ও জীব-এর বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। এছাড়া এর পরোক্ষ প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, মরুময়তা দেখা দেয়। ওজোন স্তর ক্ষয়রোধ প্রতিকারে বিশ্ববাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হয়। জাতিসংঘভুক্ত সকল সদস্য রাষ্ট্র মন্ট্রিল প্রটোকল অনুস্বাক্ষর করেছে।

এই প্রটোকলটি প্রথমে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী ৮টি দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে গৃহীত হয়। বর্তমানে এই প্রটোকলের আওতায় প্রায় ১০০টির মতো ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে যার মধ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার ও উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে রোধ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুণি রশ্মি থেকে জীববৈচিত্র্যকে সুরক্ষা দিতে পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলের ওজোনস্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাণিজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ এই ওজোনস্তর ধ্বংসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ করে শীতকালীন শিল্পে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা সিএফসি গ্যাস বড়ো ভূমিকা রাখে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৮৭ সালে ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত জাতিসংঘের মন্ট্রিল প্রটোকল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিগত ৩২ বছরে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। আগামী ২০৬০ সালের মধ্যে ওজোনস্তর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাই জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক নির্ধারিত এবারের বিশ্ব ওজোন দিবসের প্রতিপাদ্য মন্ট্রিল প্রটোকল: ওজোনস্তর সুরক্ষার ৩২ বছর সময়োপযোগী বলে মনে করি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, বাংলাদেশও এ প্রটোকল বাস্তবায়নের অভাবনীয় সাফল্যের গর্বিত অংশীদার। আমাদের সরকারই ১৯৯৭ সালে বায়ু দূষণ ও ওজোনস্তর ক্ষতিকারক গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার রোধে বায়ুর মানমাত্রা নির্ধারণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। তাছাড়া, পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ বিপজ্জনক জাহাজ ভাঙার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১ এবং ২০১৪ সালে একটি সংশোধিত ও পরিমার্জিত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।

মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ও সরকার একাযোগে কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে এই প্রটোকল আজ তার উদ্দেশ্য পূরণে সর্বতোভাবে সফল হয়েছে। বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এই প্রটোকল বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

জাতীয় বিষয়াবলি দেশের অহংকার

সাব্বির আহমদ

বিশ্বের প্রতিটি দেশের রয়েছে নিজস্ব ভূখণ্ড, মানচিত্র, ভাষা, পতাকা, জাতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি– যা প্রতিটি দেশের জন্য অহংকার ও অস্তিত্ব বহন করে। প্রতিটি দেশের জাতীয় বিষয়াবলি সে দেশের জাতীয় সম্পদ ও অহংকার। তাই আমাদের দেশের জাতীয় বিষয়াবলি আমাদের জাতীয় সম্পদ ও অহংকার।

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। জাতীয় ভাষা বাংলা। বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষার অবস্থান উজ্জ্বল। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রাণ দেওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের জন্ম হয়েছে। আর এ ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বাধিকার আন্দোলন ও পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, যার নাম বাংলাদেশ। এখন বিশ্বের প্রায় ৪৮টি দেশে বাংলা ভাষার চর্চা আছে। বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিদেশের বেশ কয়েকটি বেতারে খবরসহ বাংলা অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে। বেশ কয়েকটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা পড়ানো হয়। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার ওপর উচ্চতর ডিগ্রি এমনকি পিএইচ ডি প্রদান করা হচ্ছে। কম্পিউটার চালু হবার পর কম্পিউটারে বাংলা ভাষা চালু নিয়ে বেশ সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সে সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটেছে। ইউনিকোডে বাংলা ভাষা চালু হওয়ায় কম্পিউটারে সে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষা থেকে বহু গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। বাংলা শুদ্ধভাবে লেখার জন্য বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান রীতির অনুশীলন আবশ্যক।

২০১৯ সালের একুশে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সুরক্ষা করতে হবে'। এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বাংলায় রায় লেখার জন্য অনুরোধ করেছেন।

জাতীয় সংগীত আমার সোনার বাংলা (প্রথম ১০ লাইন)। জাতীয় সংগীতের রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জাতীয় সংগীতের প্রথম ইংরেজি অনুবাদক হচ্ছেন সৈয়দ আলী আহসান। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলার কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ। পরে ৩রা মার্চ তারিখে ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভা থেকে ঘোষিত ইশতাহারে এই গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে এই গান প্রথম জাতীয় সংগীত হিসেবে পরিবেশন করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সুরকার অজিত রায় গানটির বর্তমানে প্রচলিত যন্ত্রসুর করেন। ১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার গানটির প্রথম দশ লাইন জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়ার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ গানটির মোট চরণ সংখ্যা ২৫টি। যন্ত্রসংগীতে ও সামরিক বাহিনীতে ব্যবহার করা হয় প্রথম চারটি লাইন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে ব্যবহার করা 'আমার সোনার বাংলা' গানটির স্বরলিপি বিশ্বভারতী সংগীত বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত।

আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধিকার আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাদেশিক আন্দোলনসহ সকল ক্ষেত্রে এ গানটি সর্বদা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

শ্রোতাদের পছন্দানুসারে বিবিসি বাংলার তৈরি সেরা বিশটি বাংলা গানের তালিকায় আমাদের জাতীয় সংগীত প্রথম স্থান দখল করে। ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ২০৫টি দেশের জাতীয় সংগীতের তুলনামূলক বিচারে দৈনিক গার্ডিয়ান পত্রিকার মতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

আমাদের দেশে স্কুল-কলেজগুলোতে নিয়মিত অ্যাসেম্বলি, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। সিনেমা হলে জাতীয় পতাকা প্রর্দশন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এছাড়া এখনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলার সময় মাঠে জাতীয় পতাকা প্রর্দশন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। জাতীয় সংগীতের বাণিজ্যিক ব্যবহার অবৈধ ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হচ্ছে সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত। পতাকার রূপকার ছিলেন চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান। আদি বা প্রথম পতাকাটি আজকের পতাকার মতো ছিল না। আদি পতাকাটি এঁকেছিলেন স্বভাবশিল্পী ছাত্রনেতা শিবনারায়ণ দাশ (৬ই জুন, ১৯৭০ সাল)। এই পতাকা তৈরির জন্য কাপড় দিয়েছিলেন ঢাকা

নিউমার্কেটের অ্যাপোলো টেইলার্সের মালিক বজলুর রহমান লস্কর। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান কলাভবনের সামনের পশ্চিম গেটেই বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ডাকসুর ভিপি ছাত্রনেতা আ স ম আবদুর রব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চে তাঁর বাসভবনে প্রথম আনুষ্ঠানিক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এবং একই দিন সারা দেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। দেশের বাইরে সর্বপ্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনে। বিজয়ের পর ১৯৭২ সালে শিবনারায়ণ দাশের ডিজাইন করা পতাকার মাঝে মানচিত্রটি বাদ দিয়ে পতাকার মাপ, রং ও তার ব্যাখ্যা-সংবলিত একটি প্রতিবেদন দিতে বলা হয় পটুয়া কামরুল হাসানকে। কামরুল হাসান আমাদের জাতীয় পতাকার যে রূপ দিয়েছিলেন, সেটিই বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সবুজ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত। সবুজ রং বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতি ও তারুণ্যের প্রতীক, বৃত্তের লাল রং উদীয়মান সূর্য, স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারীদের রক্তের প্রতীক। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার এই রূপটি ১৯৭২ সালের ১৭ই জানুয়ারি সরকারিভাবে গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের পতাকা আয়তাকার। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬ এবং মাঝের লাল বর্ণের বৃত্তটির ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের বাঁ দিকের নয় ভাগের শেষ বিন্দুর ওপর অঙ্কিত লম্ব এবং প্রস্থের দিকে মাঝখান বরাবর অঙ্কিত সরল রেখার ছেদ বিন্দু হলো বৃত্তের কেন্দ্র। পতাকার দৈর্ঘ্য ১০ ফুট হলে প্রস্থ হবে ৬ ফুট, লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে ২ ফুট, পতাকার দৈর্ঘ্যের সাড়ে ৪ ফুট ওপরে প্রস্থের মাঝ বরাবর অঙ্কিত আনুপাতিক রেখার ছেদ বিন্দু হবে লাল বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু। ভবনে ব্যবহারের জন্য পতাকার বিভিন্ন মাপ হলো ১০ ফুট বাই ৬ ফুট, ৫ ফুট বাই ৩ ফুট এবং ২৫ ফুট বাই ১৫ ফুট। মোটরগাড়িতে ব্যবহারের জন্য পতাকার বিভিন্ন মাপ হলো ১৫ ইঞ্চি বাই ৯ ইঞ্চি এবং ১০ ইঞ্চি বাই ৬ ইঞ্চি। আন্তর্জাতিক ও দ্বিপক্ষীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য টেবিল পতাকার মাপ হলো ১০ ইঞ্চি বাই ৬ ইঞ্চি।

বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সরকারি ও বেসরকারি ভবন, বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশন ও কনস্যুলেটে পতাকা উত্তোলন করতে হয়। শোক দিবসে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। পতাকা অর্ধনমিত রাখার ক্ষেত্রে প্রথমে পতাকা শীর্ষস্থান পর্যন্ত ওঠাতে হয়, তারপর অর্ধনমিত অবস্থানে রাখতে হয়। দিনের শেষে পতাকা নামানোর সময় পুনরায় শীর্ষস্থান পর্যন্ত উঠিয়ে তারপর নামাতে হয়। সরকারের অনুমতি ছাড়া জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা যাবে না।

আমাদের জাতীয় প্রতীক হচ্ছে উভয় পাশে ধানের শীষবেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা। তার মাথায় পাট গাছের পরস্পর সংযুক্ত তিনটি পাতা এবং উভয় পাশে দুটি করে তারকা। জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার কামরুল হাসান। এটি ১৯৭২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করে। জাতীয় প্রতীক ব্যবহারের অধিকারী হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় মনোগ্রাম হচ্ছে লাল রঙের বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের ওপর দিকে লেখা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নিচে লেখা 'সরকার' এবং বৃত্তের দুপাশে দুটি করে মোট ৪টি তারকা।

আমাদের জাতীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার হচ্ছেন এ. এন. সাহা। এছাড়া আমাদের জাতীয় ধর্ম ইসলাম, জাতীয় ফল হচ্ছে কাঁঠাল, জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার, জাতীয় মাছ ইলিশ, পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে আমাদের জাতীয় বন সুন্দরবন, জাতীয় খেলা কাবাডি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ রয়েছে সাভারে। এরপরেও রয়েছে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, জাতীয় চিড়িয়াখানা ঢাকার মিরপুরে, জাতীয় গ্রন্থাগার ঢাকার আগারগাঁয়ে, জাতীয় জাদুঘর ঢাকার শাহবাগে ও জাতীয় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম ঢাকার গুলিস্থান এলাকায়।

জাতীয় ফুল শাপলা। দেশের সর্বত্র খালবিলে দেখা যায়। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল হিসেবে সাদা শাপলাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

জাতীয় পাখি দোয়েল। জাতীয় পাখি দোয়েলের দেখা পাওয়া যায় গ্রামের বাড়ির আশপাশে।

জাতীয় মাছ ইলিশকে রক্ষা করার জন্য সরকারের যথেষ্ট উদ্যোগ ও প্রকল্প গ্রহণের ফলে ইলিশ মাছের বংশবিস্তার বেড়েছে।

আমাদের জাতীয় বন সুন্দরবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা ও গবেষণা করছে। আমাদের দেশের জাতীয় পশু রয়েলবেঙ্গল টাইগার। এ পশুটিকে টিকিয়ে রাখতে সরকারের রয়েছে নানা ধরনের উদ্যোগ।

জাতীয় ফল কাঁঠাল, যা বাংলাদেশের প্রায় সকল স্থানে পাওয়া যায়। আমগাছকে জাতীয় বৃক্ষ নির্বাচিত করা হয়। আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৩৯ বছর পর ২০১০ সালের ১৫ই নভেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনায় আমগাছকে জাতীয় বৃক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। আমগাছ ফলদ বৃক্ষ ছাড়াও একটি ঔষধি বৃক্ষ।

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও শহিদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশ এবং আমাদের নিজস্ব জাতীয় বিষয়াবলি পেয়েছি। আমাদের দেশের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোয়া লেগেছে, দেশটি ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। তবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করতে হবে– এক্ষেত্রে জাতীয় বিষয়াবলির প্রতি আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

লেখক: গবেষক ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক

বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ববন্ধু আখ্যা দিল জাতিসংঘ

প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সদর দফতরে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড' বা বিশ্ববন্ধু হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্বনেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা উল্লেখ করে তাঁকে 'ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড' বা বিশ্ববন্ধু আখ্যা দেন জাতিসংঘের সাবেক জান্তার সেক্রেটারি জেনারেল ও জাতিসংঘ নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল করিম চৌধুরী। ১৬ই আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদন: জেসিকা হোসেন

শারদীয় দুর্গোৎসব

ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। বিশেষভাবে বাঙালি হিন্দুদের, তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অবাঙালি হিন্দুরাও ভিন্ন ভিন্ন নামে এ উৎসব পালন করে। বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়াও বিশ্বের কয়েকটি দেশে এ উৎসব পালিত হয়। দেবী দুর্গা হলেন শক্তির রূপ। তিনি আদ্যাশক্তি। তিনি পরব্রহ্ম। দুর্গা মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। দুর্গ বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়। ব্রহ্মার বরে পুরুষের অবধ্য মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য দখল করলে রাজ্যহারা দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে যে দেবী আবির্ভূত হন তিনিই দুর্গা। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে এ দেবী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীর আর এক নাম হয় মহিষমর্দিনী। হিন্দু শাস্ত্র মতে, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়-শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন দুর্গা। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালীবিলাসতন্ত্র, কালিকা পুরাণ, দেবীভাগবত, মহাভাগবত, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দুর্গোৎসববিবেক, দুর্গোৎসবতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে দেবী দুর্গা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে পুরাণে লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজনপ্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তাঁরা দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় তুষ্টা দেবীর বরে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ পূজা বসন্তকালে হয়েছিল বলে এর নাম 'বাসন্তী' পূজা। কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে অর্থাৎ শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। তখন থেকে এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয়া দুর্গাপূজা। বর্তমানে শারদীয়া পূজাই সমধিক প্রচলিত।

বঙ্গদেশে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) রাজত্বকালে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, মতান্তরে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮৩)। কিন্তু জীমূতবাহনের (আনু. ১০৫০-১১৫০) দুর্গোৎসবনির্ণয়, বিদ্যাপতির (১৩৭৪-১৪৬০) দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) দুর্গোৎসববিবেক, কৃত্তিবাস ওঝার (আনু. ১৩৮১-১৪৬১) রামায়ণ, বাচস্পতি মিশ্রের (১৪২৫-১৪৮০) ক্রিয়াচিন্তামণি, রঘুনন্দনের (১৫শ-১৬শ শতক) তিথিতত্ত্ব ইত্যাদি গ্রন্থে দুর্গাপূজার বিস্তৃত বর্ণনা থাকায় অনুমান করা হয় যে, বাংলায় দুর্গাপূজা দশম অথবা একাদশ শতকেই প্রচলিত ছিল। হয়ত কংসনারায়ণ কিংবা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে তা জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্যম গ্রন্থে বর্ণিত দুর্গা ও দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে দেবী দুর্গার কাহিনিগুলো সর্বাধিক জনপ্রিয়। শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ দুর্গাপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শ্রীশ্রীচণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর একটি নির্বাচিত অংশ। এতে তেরোটি অধ্যায়ে মোট সাতশটি শ্লোক আছে।

মা দুর্গা

শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

শরৎ এলে মনে পড়ে
দুর্গাপূজার কথা।
তারই সাথে মনে পড়ে
সেই ছোটোবেলার কথা।
কৈলাস থেকে মা দুর্গা
আসেন বাপের বাড়ি।
সেই কটা দিন আমরা সবাই
করি নাকো আড়ি।
ঢ্যাম কুড় কুড় বাদ্যি বাজায়
পুজোর সময় ঢাকি।
তখন মোরা আনন্দেতে
দু'হাত তুলে নাচি।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল,
বাজে কাঁসর ঘণ্টা।
ওড়ে বেলুন, ওড়ে ফানুস,
ফাটে বাজি-পটকা।
নতুন জামা গায়ে দিয়ে
ঠাকুর দেখি কত।
নানান জায়গা থেকে আসে
মানুষ শত শত।
মা দুর্গা চলে গেলে
কষ্ট মনে হবে।
সারা বছর বসে থাকি
মা আসবেন কবে?

দেবী সাধারণত দশভুজা, তবে শাস্ত্রানুসারে তাঁর বাহুর সংখ্যা হতে পারে চার, আট, দশ, ষোলো, আঠারো বা কুড়ি। দুর্গার দশ বাহুতে যে দশটি অস্ত্র রয়েছে, সেই অস্ত্রসমূহও বিভিন্ন প্রতীকের ইঙ্গিতবাহী।

বাংলায় দেবী দুর্গার যে মূর্তিটি সচরাচর দেখা যায় সেটি পরিবার সমন্বিতা বা সপরিবার দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তির মধ্যস্থলে দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী ও মহিষাসুরমর্দিনী; তাঁর মুকুটের ওপরে শিবের ছোটো মুখ, দেবীর ডানপাশে ওপরে দেবী লক্ষ্মী ও নিচে গণেশ; বামপাশে ওপরে দেবী সরস্বতী ও নিচে কার্তিকেয়। বাকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-সংলগ্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার এক বিশেষ মূর্তি দেখা যায়। সেখানে দেবীর ডানপাশে ওপরে গণেশ ও নিচে লক্ষ্মী, বামে ওপরে কার্তিকেয় ও নিচে সরস্বতী এবং কাঠামোর ওপরে নন্দী-ভৃঙ্গীসহ বৃষভবাহন শিব ও দুপাশে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া অবস্থান করেন। কোথাও কোথাও দুর্গোৎসবে লক্ষ্মী ও গণেশকে সরস্বতী ও কার্তিকেয়ের সঙ্গে স্থান বিনিময় করতে দেখা যায়। আবার কোথাও দুর্গাকে শিবের কোলে বসে থাকতেও দেখা যায়। এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রকমের স্বতন্ত্র মূর্তিও চোখে পড়ে। তবে দুর্গার রূপকল্পনা বা কাঠামোবিন্যাসে যতই বৈচিত্র্য থাকুক, দুর্গোৎসবে প্রায় সর্বত্রই দেবী দুর্গা সপরিবারে পূজিত হন।

১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিতে কুমারী পূজার প্রবর্তন করেন। রঘুনন্দন প্রণীত তত্ত্ব অনুসারেই পূজা নিষ্পন্ন হয়। কুমারী পূজা হলো তন্ত্রশাস্ত্রমতে অনধিক ষোলো বছরের অরজঃস্বলা কুমারী মেয়ের পূজা। ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন-মন্দিরে অষ্টমীর দিন কুমারী পূজা করা হয়।

দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন হয় সন্ধিপূজা। এ পূজার সময়কাল ৪৮ মিনিট। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এই পূজা। যেহেতু অষ্টমী ও নবমী তিথির সংযোগ স্থলে এই পূজা হয় তাই এই পূজার নাম সন্ধিপূজা অর্থাৎ সন্ধি-কালীন পূজা।

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম তিথি পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি তিথি যথাক্রমে 'দুর্গাষষ্ঠী', 'মহাসপ্তমী', 'মহাষ্টমী', 'মহানবমী' ও 'বিজয়াদশমী' নামে পরিচিত। শুক্লা ষষ্ঠীতিথিতে দেবীর বোধন হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী (মহানবমী)-তে পূজা দিয়ে দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বাঙালি হিন্দু এই পূজা উপলক্ষে নতুন পোশাক পরে। পূজার সময় চলে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে প্রতিমা দর্শন। সকলে কোলাকুলি, প্রণাম, আশীর্বাদ ইত্যাদির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। আত্মীয়স্বজন সকলে একত্র মিলিত হয়। আর জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে দুর্গোৎসব হয়ে ওঠে সর্বজনীন। বাঙালিরা এই উৎসবকে হিমালয়ে দেবী দুর্গার বাপের বাড়ি ফেরার অনুষ্ঠান হিসেবেই দেখে।

বাংলাদেশের সর্বত্রই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কেউ ব্যক্তিগতভাবে করে, কেউবা সমষ্টিগতভাবে। সমষ্টিগত পূজাকে বলা হয় বারোয়ারি বা সর্বজনীন দুর্গোৎসব। ঢাকেশ্বরী মন্দিরসহ সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

লেখক: সাব এডিটর, সচিত্র বাংলাদেশ, ডিএফপি

নৌপরিবহণ খাতে সরকারের সাফল্য

জান্নাত হোসেন

দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহণ খাতের সমন্বয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় স্বার্থে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে পুনর্বিন্যাসপূর্বক বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়কে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় হিসেবে নামকরণ করা হয়। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় ৯টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে নৌপথের যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ, নাব্যতা বৃদ্ধি, নৌ-বন্দরসমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের উন্নয়ন, স্থল বন্দর উন্নয়ন, সমুদ্র পথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দক্ষ নাবিক তৈরির দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

* নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর ও স্থল বন্দরসমূহের ব্যবস্থাপনা, বাতিঘর ও বয়াবতি ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
* নাব্যতা রক্ষাকল্পে নৌপথ ড্রেজিং, নিরাপদ নৌ চলাচলের জন্য বয়া লাইটেড নির্দেশিকা ও পিসি পোল স্থাপন
* নৌ বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সহযোগিতা
* অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ও জাহাজ চলাচল, মেরিন সার্ভিসেস এবং নিরাপদ নৌ চলাচল নিশ্চিতকরণ
* অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
* যান্ত্রিক নৌযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ, নৌযান জরিপ ও রেজিস্ট্রেশন
* সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন, নৌ-বাণিজ্য জাহাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
* মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপসমূহের মধ্যে এবং অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
* মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়াদি সমন্বয় ও গবেষণা
* জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন
* আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং বিভিন্ন দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে চুক্তি ও স্মারক সম্পর্কিত বিষয়াদি
* আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চার্জ সম্পর্কিত বিষয়াদি।

নৌ খাতে সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ

১. মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ১০টি বেসরকারি মেরিটাইম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং এগুলো পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে

২. নাবিকদের বিদেশি জাহাজে যোগদান সহজ করার উদ্দেশ্যে আইএলও কনভেনশনের আলোকে সিফেয়ারার্স মেশিন রিডেবল আইডি ডকুমেন্ট জারির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে

৩. মেরিটাইম লেবার কনভেনশন অনুসমর্থন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

৪. মেরিটাইম লেবার কনভেনশনের চাহিদা অনুযায়ী নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পাদনের প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে

৫. অভ্যন্তরীণ জাহাজে রিভারসিবল গিয়ার সংযোজন করে দুর্ঘটনা হ্রাস করা হয়েছে

৬. মানসম্মত নৌযান নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ডকইয়ার্ড নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

বঙ্গবন্ধু নদী পদক প্রদান করবে সরকার

দেশের নদীর রক্ষায় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে উৎসাহ দিতে 'বঙ্গবন্ধু নদী পদক' প্রদান করবে সরকার

নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় 'বঙ্গবন্ধু নদী পদক নীতিমালা ২০১৯' সংক্রান্ত একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। ২৮শে মে প্রতিষ্ঠানটির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

নদী রক্ষা বিষয়ক যে-কোনো ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অবদানের জন্য যে-কোনো ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে 'বঙ্গবন্ধু নদী পদক' প্রদান করা হবে। উক্ত কাজে বিশেষ অবদানের জন্য কোনো সরকারি কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠানকে এ পদক প্রদানে বাধা থাকবে না।

দূষণ ও অবক্ষেপণের কারণে বাংলাদেশের অনেক নদীর মৃতপ্রায় অবস্থা, আবার অনেক নদী অবৈধভাবে দখল করা হচ্ছে।

'বঙ্গবন্ধু নদী পদক' জেলা পর্যায়ে একটি এবং জাতীয় পর্যায়ে তিনটি প্রদান করা হবে। জেলা পর্যায়ে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে বিশেষ অবদানের জন্য ১৮ ক্যারেট মানের ১৫ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় পুরস্কারের সংখ্যা ও মূল্যমান বাস্তবতার নিরিখে পরিবর্তন করতে পারবে।

৭. সনদ বর্তমান সময়োপযোগী করে আধুনিকায়ন করা হয়েছে

৮. বাংলাদেশ নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ অফিসার ও নাবিক প্রশিক্ষণ, সনদায়ন, নিয়োগ, কর্মঘণ্টা এবং ওয়াচকিপিং বিধিমালা ২০১১ জারি করা হয়েছে

৯. মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩-এর আওতায় নেভি সংগ্রহ বিধিমালা, ২০১৩ জারি করা হয়েছে

১০. নাবিকদের সিডিসি'র ডাটা বেইজ তৈরি করত, অনলাইন যাচাই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে

১১. নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রামে নাবিক ড্রপিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে

১২. নৌপরিবহণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ জাহাজের নাবিকদের সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট অব প্রফিসিয়েন্সি তৈরির কাজ সম্পাদনের জন্য মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে

১৩. মেরিটাইম লেবার কনভেনশন-২০০৬ এবং সিফেয়ারার্স আইডেনটিটি ডকুমেন্ট (এসআইডি) কনভেনশন সংশোধিত ২০০৩ অনুসমর্থন করা হয়েছে

১৪. বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আমদানি-রফতানি পণ্য পরিবহণ সহজ ও পরিবহণ সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য এ দু'দেশের মধ্যে বোস্টাল শিপিং চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

শরৎ ও কাশফুল: একে অপরের

মো. শাহাজাহান হোসেন

বর্ষার পরে তৃতীয় ঋতু হিসেবে শরৎ এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে প্রকৃতিতে আবির্ভূত হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন (আগস্ট মাসের মধ্যভাগ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত) মিলে শরৎকাল। ভাদ্র (সেপ্টেম্বর) মাসে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, আদ্রতাও সর্বোচ্চে পৌঁছে। শরৎকালে বনে-উপবনে শিউলি, গোলাপ, বকুল, মল্লিকা, কামিনী, মাধবী প্রভৃতি ফুল ফোটে। বিলে-ঝিলে ফোটে শাপলা আর নদীর ধারে কাশফুল। এ সময়ে তালগাছে তাল পাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজাও এ সময় অনুষ্ঠিত হয়। শরৎকালই বর্ষার সৌন্দর্যকে সাদরে গ্রহণ করে অপরূপ সাজে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। দিনের বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রোদে গ্রাম-বাংলার মাঠঘাট, নদীনালা, জলাশয় ঝলমল করে। শরতের এমন ভোলানো রূপ সত্যিই অতুলনীয়। বাংলাদেশের ঋতু পরিক্রমায় শরৎকালের আছে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফুল, ফল আর ফসলের দেশ বাংলাদেশের এই ঋতু সবার মনেই আনন্দের সঞ্চার করে। তাই শরতের আবেদন প্রতিটি মানুষের কাছে অপূরণীয়। দেশের মাটি আর মানুষের সাথে গভীরভাবে মিশে আছে শরৎকাল। শরৎকাল স্বপ্নের মতো মায়াবী আর ছবির মতো ঝকঝকে। শরৎ তাই সুন্দরের ডালা সাজিয়ে আমাদের গ্রাম বাংলার প্রকৃতিকে উদার হাতে বিলায়। শরতের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–

শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনে পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।

শরতের ভোরবেলার সৌন্দর্য অতুলনীয়। হালকা কুয়াশা আর বিন্দু বিন্দু জমে ওঠা শিশির, শরৎ প্রভাতের প্রথম সলজু উপহার। এর ওপর যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন মনে হয় চারদিকে ছড়িয়ে আছে অজস্র মুক্তদানা। শরৎকালের আকাশ গাঢ় নীলিমার অবারিত বিস্তার। ক্ষান্ত বর্ষণ স্বপ্নীল আকাশের পটভূমিকায় জলহারা লঘুভার মেঘপুঞ্জ। ধীর মন্থর ছন্দে তার কেবলই সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা। দিকে দিকে তার প্রসন্ন হাসির নম্র আভা ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতির বুকে। এমনি করে সকাল পেরিয়ে গড়িয়ে আসে শরৎ দুপুর। শরৎ দুপুরের আলোয় ঘাস, ধান, বাঁশঝাড়, খড়ের চালে জমে থাকা শিশির বিন্দুগুলো শুকিয়ে যায়। গাছে গাছে পত্রপল্লবে সবুজের ছড়াছড়ি। গাছে গাছে, ডালে ডালে, দোয়েল পাপিয়ার প্রাণমাতানো সুর মূর্ছনা। তখন নীরবে পাখা মেলে উড়ে সাদাচিল। মেঘের কাছাকাছি ডানা মেলে ঈগল। আসলেই শরতের দুপুর বড়োই নির্মল। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হয় তখন এর রূপ আরো মায়াবী মনে হয়। রোদ তার তেজ কমিয়ে নিজেকে অনেকটা শীতল করে নেয়। সবুজ গাছগাছালি রোদ পেয়ে বেশ তাজা হয়ে উঠে। স্নিগ্ধতা আর কোমলতার এক অপূর্ব রূপ নিয়ে আসে শরতের রাত। শরৎ রাত্রির চাঁদ সারা রাত ধরে মাটির শ্যামলিমায় ঢেলে দেয় জোছনাধারা। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে বয়ে যায় স্নিগ্ধ বাতাস। দূর থেকে ভেসে আসে শিউলির সুবাস। ঝকঝকে জোছনায় পাখিদের ভ্রম হয়। ভোর হয়ে গেছে ভেবে কাক ডেকে ওঠে। ভোর হতে না হতেই শিশির বিন্দু ও শিউলি ফুল ঝড়ে পড়ে সবুজ ঘাসে।

শরৎকাল স্বপ্নের মতো মায়াবী আর ছবির মতো ঝকঝকে। শরৎ তাই সুন্দরের ঢালা সাজিয়ে আমাদের প্রকৃতিকে উদার হাতে সাজায়। কাশবন সেই দৃশ্যের কোমল ছবি। কাশবনে উড়ে যায় নীল, লাল, বেগুনি, হলুদ আর কালো ধূসর রঙের প্রজাপতি। শরৎ পাখির পাখায় কম্পন জাগায়। ফুলের মাঝে আনে স্পন্দন। এ সময় বাতাস থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কাশবনে ছুটে আসে মৌমাছি। রূপে গুণে সৌন্দর্যের তুলনা হয় না বলেই শরৎ রূপের রানি। নদীর ধারে, কাশের বনে, বাতাসের দোলায়, শরতের আগমন যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরো সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে তোলে। তাই প্রকৃতিতে যখন শরৎ আসে তখন কাশফুলই জানিয়ে দেয় শরতের আগমনি বার্তা। শরতের বিকেলে নীল আকাশের নিচে দোল খায় শুভ্র কাশফুল। কাশফুল মূলত এক ধরনের ঘাস জাতীয় ফুল। এ ফুলের ডাটা অনেক লম্বা হয়। ডালের মধ্যে অনেক শাখা থাকে। এই শাখাগুলো যখন পূর্ণ হয় তখনি ফুল ফোটে। কাশফুল দু ধরনের হয় যেমন: পাহাড়ি কাশফুল, অন্যটি

চর অঞ্চলের কাশফুল। পালকের মতো নরম কাশফুল সাদা রঙের হয়ে থাকে। এই ফুল মনের মধ্যে এক শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। আর তখনি কবির হৃদয় থেকে কবিতা-গান বেরিয়ে আসে।

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালি মালা
নবীন ধানের মঞ্জরি দিয়ে সাজায়ে এনেছি বরণডালা।

শরৎ কালে মানুষের মনে লাগে উৎসবের রং। তখন বাঙালির হৃদয়মন আসন্ন উৎসবের আনন্দ জোয়ারে প্লাবিত হয়। বাঙালির মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ শারদ উৎসব দুর্গাপূজার আয়োজনে মুখর হয় বাংলার গ্রাম নগর। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও শরৎ ঋতুর রয়েছে এক অপরিহার্য ভূমিকা। শরৎ ফসলের ঋতু নয় বটে, তবে আগামী ফসলের সম্ভাবনার বাণী-ই সে বহন করে আনে। পাকা ধানের ডগায় সোনালি রোদ গলে গলে পড়ে। তখন কৃষকের চোখ আনন্দে ভরে ওঠে। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত দেখে কৃষক আশায় বুক বাঁধে। এর ওপর বাংলাদেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব রচিত হয়। তাই কৃষিনির্ভর শরৎ কেবলই অফুরন্ত স্নিগ্ধ-বিমুগ্ধ সৌন্দর্যের ঋতুই নয় বরং নানা ক্ষেত্রেই এ ঋতুর অবদান রয়েছে। তবে এ ঋতুর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সাদা রঙের কাশফুল। যা শরতের চিরকালীন রূপ। তাই কাশফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে আমাদের শরতের কাছে যেতেই হবে। পরিশেষে বলতে হয় শরৎ ও কাশফুল: একে অপরের।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

প্রান্তজনের স্বাস্থ্যসেবায় অনন্য কমিউনিটি ক্লিনিক

মো. শামীম সিকদার

গর্ভবতী মায়েদের প্রসব পূর্ব ও পরবর্তী সেবা দেওয়া, শিশুর সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদান, গ্রামীণ জনপদের পিছিয়ে পড়া লোকজনের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প গ্রহণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতী ইউনিয়নের গিমাডাঙ্গা গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্‌বোধনের মাধ্যমে তৃণমূলের জনগণের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা কার্যক্রমের সূচনা করেন। একটি কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্‌বোধনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার ধারণাটি আমি জাতির পিতার কাছ থেকে পেয়েছি। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের মধ্যে ১০ হাজার ৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেন এবং ৮ হাজার ক্লিনিক চালু করেন। কিন্তু ২০০১ সালে পরবর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প বন্ধ করে দেয় এবং ২০০৮ সাল পর্যন্ত এসব কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বন্ধ ছিল। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুনরায় কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প চালু করেন। এ সময়ে ৫ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পে ১৩ হাজার ৫ শত কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার-সিএইচসিপি নিয়োগ দেওয়া হয় এবং বন্ধ ক্লিনিকগুলো চালু করা হয়। বর্তমানে প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক সারা দেশে পল্লি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করছে। সরকার ২০০৯ সালে ২৬শে এপ্রিলকে 'কমিউনিটি ক্লিনিক দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। একইসঙ্গে কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য 'শেখ হাসিনার অবদান কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ' শীর্ষক স্লোগান ঘোষণা করা হয়।

গ্রামীণ জনপদের প্রতি ৬ হাজার অধিবাসীর জন্য স্থাপন করা হয়েছে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক। প্রত্যহ প্রতি ক্লিনিকে গড়ে ৪০ থেকে ৪৫ জন মানুষ সেবা নিতে আসে। সেবা গ্রহীতার ৮০ শতাংশ নারী ও শিশু। দেশের প্রায় ৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে নরমাল ডেলিভারি করানোর সেবা দেওয়া হচ্ছে। এসব ক্লিনিকে প্রায় ৬০ হাজার নরমাল ডেলিভারি করানো সম্পন্ন হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে নিয়মিতভাবে ৩০ ধরনের ওষুধ রোগীদের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। প্রতিবছর এ খাতে সরকারের ব্যয় হয় প্রায় দুই শত কোটি টাকা। কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা প্রদানের জন্য প্রতি ক্লিনিকে একজন করে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার-সিএইচসিপি কাজ করছে। এখানে গর্ভবতী মায়েদের প্রসব পূর্ব ও পরবর্তী সেবা, শিশুর সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা, টিকাদান ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, পুষ্টি শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, বয়স্ক ও কিশোর-কিশোরীদের লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতা, সাধারণ আঘাত ও জখম, অন্যান্য অসংক্রমণ রোগ শনাক্তকরণ এবং রেফারেল সেবা পেয়ে থাকেন।

কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম দেখার জন্য বরগুনার জেলার বেতাগী উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের কিসমত ভোলানাথপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে গিয়েছিলাম। এ ক্লিনিকে সেবা প্রদানকারী সিএইচসিপিগণ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করায় সেবা গ্রহীতার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিগত ১০ বছরে দেশের স্বাস্থ্যসেবায় ঈর্ষান্বিত ইতিবাচক উন্নতি অর্জন হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনেও তা প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বব্যাংকের এ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এমডিজি'র আওতায় ৫ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার হওয়াতেই বাংলাদেশ ২০১০ সালে জাতিসংঘের এমডিজি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে নারী, শিশু ও দরিদ্রদের উন্নত মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এইচপিএনএসডিপি ভালো ভূমিকা রাখছে।

সরকার ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাছাড়া আরও উন্নত সেবার জন্য দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে একজন করে মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এমডিজি এবং ভিশন ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের অগ্রযাত্রা। এটা সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় আলোকবর্তিকা। জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার উদ্যোগ আন্তর্জাতিকভাবেও আলোচিত। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক মার্গারেট চ্যান বাংলাদেশ সফরে এসে শেখ হাসিনার কমিউনিটি ক্লিনিকের উদ্যোগকে বিপ্লব হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পরিচালনার জন্য সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল ১৩ থেকে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিউনিটি গ্রুপ আছে। এই গ্রুপের প্রধান থাকেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য। আর জমিদাতা থাকেন ভাইস চেয়ারম্যান। উল্লেখ্য, কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের জন্য স্থানীয় জনগণকে ৫ শতক জমি কমিউনিটি ক্লিনিকের নামে দান করতে হয়। ক্লিনিক পরিচালনা ও জনগণকে ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে প্রতিটি কমিউনিটি গ্রুপকে সহযোগিতার জন্য কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ গঠন করা হয়। সাপোর্ট গ্রুপে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধি নিয়ে গঠন করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, জমি প্রদানকারী, মহিলা, ভূমিহীন, কিশোর-কিশোরী। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমকে পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিশ্বব্যাংক, জাইকা, ইউনিসেফ ইত্যাদি সংস্থা আর্থিক, কারিগরি ও লজিস্টিক সরবরাহের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান উন্নয়নে কাজ করছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এসডিজি'র ৩ নম্বর অভীষ্ট সকল বয়সি সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এই অভীষ্টে ১৩ লক্ষ্যমাত্রায় আওতায় ১১টি সূচক রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসব লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক অর্জনে স্বাস্থ্য বিভাগের যতগুলা প্রকল্প রয়েছে তারমধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকের ভূমিকা হবে অন্যতম। কমিউনিটি ক্লিনিক বর্তমান সরকারের সাফল্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং অনেক দেশ তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার এ মডেল অনুকরণ করেছে।

লেখক: শিক্ষক ও কলামিস্ট

ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বে গণতন্ত্র

আহনাফ হোসেন

'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের শাসনই গণতন্ত্র'– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ১৯শে নভেম্বর ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গ বক্তৃতায় গণতন্ত্রের বহুল প্রচলিত এ সংজ্ঞাটি প্রদান করেন। বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থাই হলো গণতন্ত্র। ১৫ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস। গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy। এটি এসেছে Demo এবং Kratia দুটি গ্রিক শব্দ থেকে। শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে 'জনগণ' এবং 'শাসন বা কর্তৃত্ব'। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। গণতন্ত্র হচ্ছে মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে গঠিত ও পরিচালিত সরকার। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, গণতন্ত্র সংখ্যালঘুর মতামত ও স্বার্থকে উপেক্ষা করবে। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান।

সর্বপ্রথম গণতন্ত্র প্রচলিত হয় প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে। মধ্যযুগে ধর্ম ও রাজার দ্বৈত শাসন, স্বৈরতান্ত্রিক শাসক ও সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কেটে যায় অনেকটা সময়। দীর্ঘকাল পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে গণতন্ত্রের পুনর্জন্ম ঘটে। পরবর্তী সময়ে উনিশ ও বিশ শতকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। অষ্টাদশ শতকের গণতান্ত্রিক ভাবধারা উৎসমূল হিসেবে ইংল্যান্ডকে চিহ্নিত করা হয়। জাতিসংঘ সূত্রে জানা যায়, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট কোরাজন সি একুইনো ১৯৮৮ সালে গণতন্ত্র নবায়ন ও পুনরুদ্ধারের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে এর সূচনা ঘটান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্ট সদস্য, সুশীল নেতৃবৃন্দ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে গণতন্ত্র সম্পর্কে তিনটি মৌলিক দিক তুলে ধরা হয়। এক. সরকারে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া, দুই. পার্লামেন্ট, তিন. সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজ। প্রাথমিকভাবে সরকার, সংসদ সদস্য ও সিভিল সোসাইটির সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তঃসরকারি ফোরাম গঠন করা হয়। এ সম্মেলনে গণতন্ত্রের নীতি ও মূল্যবোধকে বিশ্বব্যাপী কার্যকরভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। সম্মেলনের আলোকে কাতার আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে আলোচনাক্রমে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালের ৮ই নভেম্বরে গৃহীত এ/৬২/৭ নং রেজ্যুলেশনের অনুবলে প্রতিবছর ১৫ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর থেকে প্রতিবছর জাতিসংঘ ও তার সদস্য দেশগুলো ১৫ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস পালন করে আসছে। এই বিশেষ দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হলো গণতন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি এবং গণতন্ত্র চর্চাকে উৎসাহিত করা। এ দিনটিতে জাতিসংঘ তার সকল সদস্য রাষ্ট্রকে নিজ নিজ জনগণের মাঝে গণতন্ত্রের গুরুত্ব, তাৎপর্য, নীতি ও আচরণসহ গণতন্ত্রাকি ব্যবস্থা সম্পর্কে গণসচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানায়।

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র একটি বিশ্বজনীন মতাদর্শ। গণতন্ত্র হলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমান ভোট বা অধিকার রয়েছে। গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন ও তৈরির ক্ষেত্রে সব নাগরিকের থাকে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়। বাংলাদেশেও সংসদীয় গণতন্ত্র চালু রয়েছে। এখানে সর্বময় ক্ষমতা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংসদের ওপরে ন্যস্ত থাকে। এই ব্যবস্থায় সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন প্রধানমন্ত্রী। যুক্তরাজ্য, ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশেই বর্তমানে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু আছে।

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল করে মানুষের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস পালনের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় কাজে অধিক সংখ্যক জনগণকে অংশগ্রহণের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে গণতন্ত্র। এটি একদিকে মানুষকে যেমন সহনশীল হতে শেখায় তেমনি পরমতসহিষ্ণুতা ও বহুমতকে সহ্য করার প্রতি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে অনুপ্রেরণা দেয়। কেবল গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সর্বাধিক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব। জনগণের জন্য, জনগণের মাধ্যমে গঠিত এ তন্ত্র বাকস্বাধীনতাসহ মানুষের সার্বিক বিকাশে সবসময় কার্যকর। আর তাই সাহিত্যে নোবেলজয়ী উইনস্টন চার্চিলের (১৮৭৪-১৯৬৪) গণতন্ত্রের বিকাশে নেতৃত্বের জন্য তাকে উপাখ্যানের মহানায়কও বলা হয়। গণতন্ত্রই হলো সর্বজননন্দিত প্রকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। এর শ্রেষ্ঠত্ব বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে এবং কাম্য শাসনব্যবস্থা।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বঙ্গবন্ধু ভ্রাম্যমাণ বইমেলার উদ্‌বোধন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু ভ্রাম্যমাণ বইমেলা'র উদ্‌বোধন করা হয়। ৩১শে জুলাই ২০১৯ রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে শ্রাবণ প্রকাশনীর উদ্যোগে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ 'বঙ্গবন্ধুকে জানো– দেশকে ভালোবাসো' স্লোগানে বেলুন উড়িয়ে ভ্রাম্যমাণ বইমেলার উদ্‌বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচাসহ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও ধর্ম ভিত্তিক ১০০টি গ্রন্থ নিয়ে ভ্রাম্যমাণ বইয়ের লাইব্রেরিটি পুরো দেশে ২০ মাসব্যাপী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বই মানবিক মূল্যবোধ গড়ে, ইতিহাস জানায় এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ দেয়। এ কারণে সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গড়ার পাশাপাশি উন্নত জাতি গঠনের জন্য বই পড়ার অভ্যাসকে ধরে রাখতে হবে। উন্নত জাতি গঠনের জন্য এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তিনি আরো বলেন, বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো ও তা বাস্তবে রূপ দানের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা অমর হয়ে রয়েছেন। মেলার মিডিয়া পার্টনার দৈনিক কালের কণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক কথাসাহিত্যিক মোস্তফা কামাল ও শ্রাবণ প্রকাশনীর স্বত্ত্বাধিকারী রবীন আহসান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

প্রতিবেদন: সাফায়েত হোসেন

নিবন্ধ

চলচ্চিত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

আপন চৌধুরী

চলচ্চিত্র হচ্ছে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম। একমাত্র চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের কথা-ভাষা-ব্যবহার থেকে শুরু করে শিল্প-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারি। ডিজিটাল বাংলাদেশে ডিজিটাল চলচ্চিত্রের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আমেরিকায় ডিজিটাল সিনেমা ইনেসিয়েটিভস (DCI)-কে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে একটি যৌথ প্রকল্প গড়ে তোলা হয়। একই সঙ্গে Society of Motion Picture Television Engineers (SMTTE) নামে পরিচিত সংস্থাটিও এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হলো। এর ফলে উদ্যোগটি যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয় এবং বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল সিনেমা নির্মাণ এবং প্রদর্শন উভয় ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণকারী সর্বজন স্বীকৃত সংস্থা International Standard Organization (ISO)-এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই উদ্যোগটি Electronic Cinema Systems (ECS) নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হলিউডের ৭টি চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান-এর সাথে সরাসরি যুক্ত হয়। পরবর্তীতে American Society of Cinematographers (ASC) নামের সংগঠনটিও এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হয়। চিত্রগ্রহণ ও প্রদর্শনের একটি সর্বজনগ্রাহ্য মান নির্ধারণ করার লক্ষ্যে বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় ৩৫ মিমি ফিল্ম ফরম্যাটের বিপরীতে একেবারে নতুন এই ফরম্যাটকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইমেজের ত্রুটিগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের পর ২০০৫ সালে DCI একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা প্রকাশ করে।

১৯৮৬ সালে বাণিজ্যিকভাবে সর্বপ্রথম ডিজিটাল ফরম্যাটের আর্বিভাব ঘটে, যখন এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান SONY। সে সময়ে বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত এনালগ পদ্ধতির হাই-ব্যান্ড ভিডিও'র পরিবর্তে সম্পূর্ণ সংকোচনবিহীন স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন (SD) ফরম্যাটটিকে ডিজিটালে রূপান্তর করে ডিজিটাল ইন্টারমিডিয়েট (DI) উদ্ভাবন করে। পরবর্তীতে এই ফরম্যাটটিকে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ডিজিটাল যুগের সূচনা করে।

ডিজিটাল সিনেমাটোগ্রাফি তত্ত্বটির ভিত তখনই মজবুত হলো যখন *স্লামডগ মিলেনিয়ার* (২০০৯) এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল ফরম্যাটের তৈরি প্রথম ছবি হিসেবে একাডেমিক পুরস্কার তথা অস্কার জিতে নেয়। এরপর সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতি ও প্রযুক্তিতে নির্মিত *লা সিক্রেটো ডি সাস ওজোস* (২০১০) ছবিটিও বিদেশি ভাষার ছবি হিসেবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার জিতল। এতে করে চলচ্চিত্রের কাজে ডিজিটাল ক্যামেরার ব্যবহার ও ডিজিটাল ফরম্যাটের গ্রহণযোগ্যতার ভিত সবদিক থেকে মজবুত হলো।

বাংলাদেশের দুটি সিনেমা হলে 2K মানের সিনে প্রজেক্টর আছে। যা DCP ব্যবহার উপযোগী। বসুন্ধরা সিনেপ্লেক্সে ব্যবহার করা হয় ক্রিস্টির তৈরি DCP ডিজিটাল সিস্টেম এবং যমুনা ব্লকবাস্টারে বারকো 23BX থ্রিডি 2K সিনে প্রজেক্টর। 2K রেজুলেশনের পিক্সেল হচ্ছে (2048 x 1080) আর 4Kতে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ (4096 x 2160) পিক্সেল।

বাংলাদেশের শতাধিক সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয় বেলজিয়ামের বারকোর তৈরি HD (RLMW6) প্রজেক্টরের মাধ্যমে। ছোটো জেলা ও মফস্বল এলাকাগুলোতে Hitachi প্রজেক্টরের পিসি ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল সিনেমা সরবরাহের জন্য সবচেয়ে সহজসাধ্য প্রক্রিয়া হচ্ছে বিশেষভাবে তৈরি একটি হার্ড ড্রাইভ। প্রেক্ষাগৃহে কিংবা সিনেমা হলে চলচ্চিত্র সরবরাহের জন্য এই হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করার ফলে কোনো চলচ্চিত্র পাইরেসি হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। পরিচালক অনন্ত জলিল তার চলচ্চিত্র *মোস্ট ওয়েলকাম* (২০১২)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পোস্ট প্রোডাকশনের কাজে প্রথম ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। ২০১৩ সালে জাজ মাল্টিমিডিয়া নামক প্রতিষ্ঠান প্রায় শতাধিক সিনেমা হলে HD প্রজেক্টর স্থাপন করে *ভালোবাসার রং* (২০১৩) ছবিটি প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল সিনেমার জগতে প্রবেশ করি। এরপর সরকারি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বিএফডিসি ডিজিটাল সিনে ক্যামেরা, ডিজিটাল এডিটিং মেশিন, ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম, 4K কালার কারেকশন মেশিন, প্রজেক্টর ও মনিটর আমদানি করে। এতে বাংলাদেশে ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

লেখক: সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা

নিবন্ধ

অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার ১৪২৪

মারুফ

অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার সমগ্র দেশের জন্য এক অনন্য ধারাবাহিকতা। যে-কোনো পুরস্কার একজন লেখক, শিল্পীকে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করে। সৃজনশীলতার সাথে দায়িত্ববোধের সংযোগ হলেই পুরস্কার প্রাপ্তির সার্থকতা বহন করে। একজন লেখক, শিল্পীর দায়বোধ থেকেই জাতি পথের দিশা পেতে পারে। খ্যাতিমান কবি, শিল্পীদের সৃজনী কর্মকাণ্ড থেকে তাই প্রতীয়মান হয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এমনটা আশা করাই সমীচীন।

অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার প্রতিবছর প্রদান করা হয়। ১৯৮১ সাল থেকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার নামে পুরস্কারটি প্রদান করে আসছে। ১৪১৪ বঙ্গাব্দে পুরস্কারের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়। 'অগ্রণী ব্যাংক বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কার'। পুরস্কারের অর্থ মূল্য ৫,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তী কালে ১৫,০০০/- টাকায় উন্নীত হয়। ১৪২৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এই নিয়মে পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। ১৪১৮ বঙ্গাব্দে আবার পুরস্কারের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'অগ্রণী ব্যাংক শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কার'। ১০ই জুন ২০১৮ অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অগ্রণী ব্যাংক শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কার কার্যক্রম বিষয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির একটি সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়। এই স্মারকের আওতায় পুরস্কারের অর্থমূল্য বৃদ্ধি করে প্রতি বিভাগে ৫০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়। ১৪২৪ বঙ্গাব্দ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের ৫০,০০০/- হাজার টাকা করে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি বাংলা বছরে প্রকাশিত সেরা বইয়ের জন্য নিম্নোক্ত ৭টি বিভাগে অগ্রণী ব্যাংক শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে আসছে।

অগ্রণী ব্যাংক শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ১০ জন সাহিত্যিক উপস্থিত থেকে প্রধান অতিথির নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকরা হলেন:

বিভাগ	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
কবিতা, ছড়া ও গান (যৌথভাবে)	দুরন্ত কিশোরের উড়ন্ত মন	আহমেদ সাব্বির
	আমার পড়া পতায় ভরা	সোহেল মল্লিক
গল্প, উপন্যাস ও রূপকথা	ঘিয়ের পিদিম	নিলয় নন্দী
জীবনী, প্রবন্ধ: বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ অথবা অন্যান্য বিষয়ক (যৌথভাবে)	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	মনি হায়দার
	গল্পে গল্পে বাংলাদেশ	শিবুকান্তি দাশ
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	পৃথিবীর বাইরে	মিন্টু হোসেন
অনুবাদ-ভ্রমণকাহিনি	লুইস ক্যারল অ্যালিসের অ্যাডভেঞ্চার	সামিন ইয়াসার
নাটক (যৌথভাবে)	আকাশ আর মৃত্তিকার গল্প	মোস্তফা হোসেইন
	বিষ্টি বন্ধু	মোহাম্মদ মারুফুল
বই অলংকরণ	এক সকালে টম	মামুন হোসাইন

পুরস্কার বিতরণ শেষে শিশুদের পরিবেশনায় সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুধী ও সাহিত্যাঙ্গনের অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

শেখ হাসিনা: জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মঈনুল হক চৌধুরী

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে
প্রায় চার দশক সময় ধরে
উজ্জ্বল এক নক্ষত্রের মতো আলো ছড়াচ্ছেন
বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা
আপোশহীন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই নেত্রী।
সংগ্রামই যেন তাঁর জীবন,
পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট
হারিয়েছেন পরিবারের প্রায় সবাইকে
তখন বাঙালি জাতির কপালে পড়ল
কলঙ্কের দুঃসহ তিলক।
অন্ধকারের জীবেরা কেড়ে নিয়েছে তাঁর পিতা
ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।
ফলে টান পড়ে বাঙালি জাতির হৃদস্পন্দনে
সেই থেকেই বিপর্যয় শুরু বাঙালির
সীমাহীন ভীরুতা, আস্থাহীনতা, দৈন্য, ধর্মান্ধতা,
অমানবিকতা ও নীতিহীনতা যখন স্বাধীন বাংলাদেশের
টুটি চেপে ধরেছে
যখন পরনির্ভরতা, পরাভবতা,
পরদাসত্বের বন্ধনে বাধা পড়েছে বাংলাদেশ
এমনি এক দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধুর মতো সহজাত সাহস
সৌম্য ও অপরাজেয় সংকল্পশক্তির প্রতীক হয়ে
আবির্ভূত হলেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা
জননেত্রী শেখ হাসিনা।
কত ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে অমানিশার আঁধার কেটে
বাঙালি জাতির জন্য তিনি নিয়ে এলেন আলোকিত ভোর
যে ভোরের আলোয় আলোকিত হলো আমার প্রিয় বাংলাদেশ।
বঙ্গবন্ধু কন্যা, তিনি হয়ে উঠেন
বাংলার অসহায়, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত
গরিব-দুঃখী মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ আশ্রয়স্থল
শেখ হাসিনা বিশ্বশান্তির অগ্রদূত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকার।
দেশের উন্নয়নে বিশ্ব মাঝে ইতিহাস গড়েছেন
আজ তিনি বিচক্ষণ এক রাষ্ট্রনায়কে পরিণত
শুভ জন্মদিনে, তাঁকে জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কত প্রাণ কত রক্তে

সৈয়দ শাহ্‌রিয়ার

চোখ মুদে রোজ পাই ভেসে আসে দেশ
যদিও কখনো হয় না মা আমার এই আমার নিদারুণ স্বদেশ
হ্যাঁ একে একে আসে হয়ত তারপর
আত্মজা, দয়িতা এমনকি,
উজাড় ভালোবাসার ডালি খোলা অহর্নিশ
তবু কেন এত ভালোবাসা
হায়রে কত রুধির, কত প্রাণ আগুন হানে আসুতে,
মনে হলে
মৃত্তিকায় খোঁজ নাও
সব জমা থাকে, কত ভালোবাসা এই মাটি ধরে।
কত প্রাণ কত রক্তে এই মাটি সাজে!

মায়ের আঁচল ধরে হাঁটি

বাবুল তালুকদার

ছোট্ট বেলায় মায়ের আঁচল ধরে
হেঁটেছিলাম প্রকৃতির চারোপাশে।
আজও প্রতিমুহূর্তে মায়ের কথা মনে পরে
মা যে আর কখনো আসবে না কোনোদিন
বাবুল বলে আমাকে আর ডাকবে না।
আলোর ভুবন ছেড়ে কাউকে কিছু না বলে
শান্তির ঠিকানায় চলে যায় মা
স্মৃতিরা তাড়া করে আমাকে প্রতিমুহূর্তে
আমি অস্থির হয়ে যাই,
ছুটাছুটি করি এখান থেকে ওখানে।
কীভাবে অসহায়ত্ব জীবন নিয়ে বেঁচে আছি
নিজেকে নিজে বুঝাতে পারি না, কষ্ট হয়।
আজও ঘরের আশপাশে শোকের ছায়া বয়ে যায়
আমি অস্থির মন নিয়ে হেঁটে চলি দূর-দূরান্তে
প্রকৃতির আশপাশে কাটাই দিন।
আমি বেদনা আর কষ্ট নিয়ে কোনোরকম
এ ভুবনে বেঁচে আছি।

আমি নরসুন্দর

রুস্তম আলী

আমি নরসুন্দর
মেঘমুক্ত আকাশ আমার মন
অস্ত্র হাতে শান্তির বাণী
অন্যের সুন্দরে নিজের জীবন গড়ি
আমি নরসুন্দর নিবেদিতপ্রাণ।
আমার হাতে জাদু আছে ঘুমপাড়ানির জাদু
আশ্রম আমার সোনামণি
আরও সোনাদাদু
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে অন্ন করে দান
কাস্তে হাতে হস্ত আমার
সুন্দর করি মানব বাগান
আমি নরসুন্দর নিবেদিতপ্রাণ।
ধারালো অস্ত্র আমার হাতে
তাতে কারো ভয় নেই
সন্ত্রাসী বলে নাহি কেহ ডাকে
আমি নরসুন্দর নিবেদিতপ্রাণ।
আমাকে নিয়ে বহু প্রবাদ আছে
নিচু জাত, হীনমনা, বংশ মর্যাদা
আরো কত কী
এতে নাহি দুঃখ পাই আমি
গভীর ব্যথা পাই মনে
যখন নাপিত বলে ডাকে।
জুতা আবিষ্কারের মতো
আমিও হবো ইতিহাস ভবে–
রাজা-বাদশা-কবি-সাহিত্যিক
যদি আমাকে নিয়ে ভাবে
আমি নরসুন্দর নিবেদিতপ্রাণ
আকাশের মতো উদার আমার মন
আমি নরসুন্দর।

কবিতার বিষয়

মাইন উদ্দিন আহমেদ

লিখতে কবিতা হন্যে হয়ে কবি
খুঁজতে থাকে কাগজ,
এরইমধ্যে ভাব যায় চলে
গলে পড়ে মগজ!
কলম হাতে নিয়ে আগের মতো সে
ফুলের দিকে চায়,
ইত্যবসরে ছটফট করে করে
কাঁটার আঘাত পায়।
জীবনযুদ্ধে তলোয়ার যখন
খোঁচা দিয়ে দিয়ে যায়,
তখনো মোদের অবুঝ কবি
রোমাঞ্চ খুঁজে বেড়ায়
ওরে আমার অবুঝ মনের
সরল ঢঙের কবি,
সময় বুঝে বিষয় না নিলে
রাতে কি পাবে রবি!

অভিনন্দন নয়

ইফফাত রেজা

অভিনন্দন চাই না বলে
তাকাই সবুজে
একটি অসাধারণ বাগানের ছবি
এঁকেছ কি–
কী যায় আসে
খোশবু থাক প্রিয়ার বুকে
নগরীর শ্বাসকষ্ট থাকে তোমার কলমে
আর কত কী,
পরিশ্রমের কলম সাড়ে তিন হাত!
মানুষ সামনে বাড়ায় পা, এগোয় আশার পথে,
বার বার...

এখানে বিয়ে পড়ানো হয়

ইমরুল ইউসুফ

এখানে বিয়ে পড়ানো হয়
বিয়ে ঘরে উলটে পড়ে পানির গ্লাস
ভেজা রেজিস্ট্রার খুন করে স্বাক্ষর।
কপোত কপোতির দুইজোড়া চোখ
আহ্লাদে অক্টোপাস
খাতা শুকাতে ব্যস্ত কাজী
লেনদেনে রঙিন পাঞ্জাবির পকেট।
ফাগুন সন্ধ্যা বাতাস হারিয়ে নিঃস্ব
প্রজাপতির পাখায় বাতাসের বুনন
রাত্রি নামিয়ে ক্লান্ত পরিযায়ী সূর্য
তারপরও মধুর গানে নাচে রাতজাগা আকাশ।
বাসর ঘরের আয়নায় মুখ দ্যাখে
দুইজোড়া মুখ
মধুপানে শঙ্খচিলের কাব্যিক আয়োজন
রতির সুগন্ধ ছড়ায়।

আকাশ থাকে কারো নজরে

শাহ্‌নাজ

আকাশ থাকে কারো নজরে,
বেদনার নীলে
শিশিরের মতো কণায় কণায়
হাসিতে-চিঠিতে মায়ের আদরে
আঁচলে আঁচলে,
দোলা খায় বিদায়ী তাল পাখায়।
পায়ের পরশে সবুজ হাঁটা চলায়
অম্লান নীলাভ্র, ওরা ছায়া পায়?
আকাশ কোথায় তুমি,
চোখ মেলে কি দেখতে হবে,
কী দুভার্গা?
থাকো না কেন মনের জানালায়!

সিঁড়ির ওপর পড়ে থাকে বাংলাদেশ

আনসার আনন্দ

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির
স্বপ্নের কারিগর সূর্যসন্তান
তোমার অঙ্গুলি ছুয়ে যায় আকাশ
জেগে উঠে ঘুমন্ত বঙ্গভূমি।
সেদিন তোমার বজ্রকণ্ঠ
আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়
'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো'
এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।
রক্ত দিয়ে কিনেছি এদেশ
এই মাটি। আমার সোনার বাংলা।
আজ লাল সবুজের পতাকা তলে
যখন আমরা স্বাধীন
আনন্দ উল্লাসে বিহঙ্গ ডানায়
হারিয়ে যাই আকাশ ঠিকানায়।
পনেরোই আগস্টের কালরাত্রি
রক্তভুক হায়নারা নৃত্য করে
বত্রিশ নম্বরের সেই বাড়িটায়
হঠাৎ রক্তবৃষ্টি ঝরে অবিরাম।
সিঁড়ির ওপর পড়ে থাকে মানচিত্র
ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ।

দাবদাহের মুক্তি

মো. ফয়সাল আতিক

শরতের রোদ আজ লাগে খুব তীব্র,
ঘাম ঝরে শ্রমিকের দিবা-নিশি নিত্য।
বৃষ্টির দেখা নাই এই রকম পরিবেশ
গাছের ছায়ায়ও নেই কোনো শান্তি
ভাদ্র-আশ্বিন তাল পাকা রোদে
কষ্টের শেষ নাহি হয়
গাছ কেটে পরিবেশের করেছি যে বারোটা
সকলে মিলে আজ খুঁজি তার উপায়টা
যদি চাও মুক্তি, করো আজ চুক্তি,
গাছ লাগালে পাব মোরা মুক্তি।

বাবুরেও লইয়া যাইবেন

দিরাজুর রহমান খান

আমি শফিকুর রহমান। বয়স প্রায় চল্লিশোর্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে বেশ কয়েক বছর বেকার জীবনযাপন করি। সরকারি প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষায় বেশ কয়েকবার অবতীর্ণ হয়েও শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের শিকা আমার বরাতে ছিঁড়েনি। আমি একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ভালো পজিশনে চাকরি করি। আমার বৈবাহিক জীবনের ইতিবৃত্ত এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়। আমার স্ত্রীর ঘরে তার কার্যপরিধির বিস্তার সীমিত। যদিও সে স্নাতক ডিগ্রিধারী, তবে একথা সত্য যে ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো চাকরি খুঁজেছিল সত্য। কিন্তু যথার্থ চাকরি না পেয়ে সে বর্তমানে একজন সুগৃহিণী বটে। আমার দুটি পুত্র সন্তান। বড়টি মালয়েশিয়াতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আর কনিষ্ঠ সন্তানটি ঢাকায় একটি সরকারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ছোট ছেলেটি তুলনামূলকভাবে বেশি মেধাবী ছাত্র। পরীক্ষার ফলাফল বরাবর ভালো। মাঝে মাঝে মনের হেঁয়ালিতে সে ক্রিকেট খেলে থাকে। খেলোয়াড়ের চেয়ে সে একজন ভালো খেলার দর্শক। অনেকটা আমার মতো। প্রাণোম্মাদনায় উদ্দীপ্ত খেলোয়াড় নয়, কেমন যেন বুড়োটেভাব। মনে হয় ভবিষ্যতে একজন বড়ো বুদ্ধিজীবি হবে। তবে আমার বড়ো ছেলেটি বলতে গেলে অনেকটা নিমরাজি হয়েই বিদেশে পাড়ি জমায়। লক্ষ্য একটাই মধ্যবিত্ত আটপৌরে জীবনের কাঙ্খীত স্বপ্ন একটি ভালো চাকরি। তাই সে সোনার হরিণ ধরার প্রস্তুতি নিয়ে মালয়েশিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ১ম বর্ষে অ্যাডমিশন নিয়েছে। কিন্তু সে নাম যশের ক্ষেত্রে খুবই উচ্চাভিলাষী। তার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল সে একজন মুথিয়ামুরুলি ধরনের মত বিশ্বখ্যাত সিজ্ন বোলার হবে। তার এই স্বর্ণোজ্জ্বল খ্যাতির স্বপ্নচূড়ায় আরোহণের পথে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক ছিলাম আমি। সে সবসময় আমাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায় এই চার্জ এনে যে, কেন আমি তাকে সাভারে বিকেএসপিতে ভর্তি করিয়ে দিলাম না। যদিও আমি তাকে পড়ালেখার পাশাপাশি কলাবাগান ক্রীড়াচক্রে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলাম বটে কিন্তু তার মতামত হলো খণ্ডিত লক্ষ্য নিয়ে কোনোদিনও সফলতা অর্জন করা যায় না। একনিষ্ঠ একাগ্রতা নিয়ে কায়মনোবাক্যে লক্ষ্যাভিসারী না হলে কোনোদিনও লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। মালয়েশিয়ার প্রবাসী ছাত্র জীবনে সে প্রায়শ: আমার কাছে মোবাইলে ফোনে কথা বলে। বিশেষ করে যখন বাংলাদেশে বিদেশিদের সাথে বিপিএলের ম্যাচ থাকে। মোবাইল ফোনে সেই একই পুরাতন অভিযোগের চর্বিতচর্বন। আমি অনেক সময় বিরক্ত হয়ে তাকে বলি 'পড়ালেখা ঠিকমত চলছে তো'? সেও প্রত্যুত্তরে আমাকে ততোধিক বিরক্তভরে বলে,

‘পড়ালেখার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না’। তুমি যা চেয়েছিলে আমি তোমাকে তাই করিয়ে দেখিয়ে দিব’। তারপর বিপুল অক্ষেপে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলে’ কিন্তু আমি যা হতে চেয়েছিলাম তা তুমি আমাকে হতে দিলে না। আমি তোমাকে কোনোদিনও ক্ষমা করবো না।’

আমি ওর এই পরিণতির জন্য অনেক সময় নিজেকে দায়ী করতাম। নিজের মধ্যে একটি স্নায়ুতান্ত্রিক অপরাধবোধ সবসময় আমার মনকে বেদনাদীর্ণ করে তুলত। হৃদয়ের উদ্‌গত অশ্রুতে চোখ সজল হয়ে উঠত।

সাভারে আমার শ্বশুরবাড়িতে এসে পুত্রার্থেকৃয়ত একই সমস্যার আবার মুখোমুখি হলাম। আমার শ্বশুর একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তার দুটি মেয়ে। বড়ো মেয়েটিকে আমি বিয়ে করেছি। কনিষ্ঠা মেয়েটি সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে মাস্টার্সের ছাত্রী। সে অবিবাহিতা। আমার শ্বশুর মহাশয় তার সমগ্র চাকরি জীবনে অর্জিত অর্থ তথা পেনশন আর প্রফিডেন্ড ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তিনতলা দুই ইউনিটের একটি বাড়ি তৈরি করেছেন। তার ব্যাংক কলোনিস্থ বিশশতাংশ বাড়ির আঙ্গিনাটা বেশ বড়োই ছিল। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে খুব সস্তায় তিনি এ জমিটি কিনেছিলেন। আঙ্গিনার শেষ প্রান্তে আধাপাকা টিনশেডের কয়েকটি ঘর করেছেন। তাতে ভাড়াটিয়ারা ছিল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কয়েকটি পরিবার। কেউ বা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বা গার্মেন্টস-এর শ্রমিক আবার কেউ ছিল দরিদ্র ভ্যানচালক।

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

সব জায়গাতেই পৃথিবীর সেই আদি ঘৃণ্য বর্গভিত্তিক শোষক আর শাসিতের অত্যাচারের নির্দয় খেলা। মার্কস এঙ্গেলসের সেই শ্রেণি সংগ্রামের দন্দ্ব। ‘তুমি শুয়ে রবে তেতলার পরে, আমি রহিব নিচে, অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভাবনা আজ মিছে’।

আমার শ্বশুর মহাশয়ের এই মাঠটিতে কেবল এ বাড়ির ছেলেমেয়েরাই খেলাধুলা করে থাকে। টিনশেড ঘরের ভাড়াটিয়াদের ছেলেরা এখানে খেলত না। হয়তো বা কোনো অলিখিত নিষেদ্ধাজ্ঞা রয়েছে। কিংবা নিজেরাই এখানে খেলতে দ্বিধাবোধ করত। সেই দীনবন্ধু মিত্রের নীল চাষিদের ছেলেদের মতো। আমি যথাসাধ্য এ নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছিলাম। তবে এ বাড়িতে বসবাসকারী সবগুলো ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে এখানে খেলাধুলা করলেও সবসময় দেখতাম একটি সুঠামদেহী তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলে কখনোই খেলতে আসত না। অথচ খেলোয়াড় হলে সে হয়তো নিশ্চয় ভালো করত। কারণ বডিফিটনেস তার ভালো ছিল। কেবল দূর থেকে এককোণে তাদের ঘরের ফটকে দাঁড়িয়ে সে খেলা দেখতো। খুবই একাগ্রচিত্তে। খেলায় অংশগ্রহণের চেয়ে খেলা দেখতেই বোধকরি সে বেশি আনন্দ পেত। আমার মনে হতো হয়তোবা ওর ওপর কোনো অদৃশ্য নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। অথচ ওকে দেখে আমার মনে হতো, খাঁচার ভিতর পাখিটি রয়েছে বটে’ কিন্তু চোখটি তার সবসময় আকাশের দিকে। ছেলেটি বাড়ির অন্য ছেলেদের সাথে পারতপক্ষে কোনো কথাই বলত না। তবে ভীষণ কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টিতে সব ছেলেদের খেলাই সোৎসাহে বেশ খুশি মনে উপভোগ করত। আমার ছেলেও এ বাড়ির ছেলেদের সাথে খেলায় অংশগ্রহণ করতো। আমার ছেলেকে ও মনে হয় খুব পছন্দ করত। কারণ আমার ছেলে ওরই সমবয়সী ছিল। তাছাড়া ও বোধ হয় এও জানত আমার ছেলে এই বাড়িওয়ালার সন্তান। একদিন সকাল দশটা এগারোটার দিকে হবে যখন আমি আমার পরিবারসহ ঢাকায় যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করছি মাঠে তখন কেউ ছিল না। সেই ছেলেটি আমার কাছে এসে বেশ দৃঢ়পায়ে দাঁড়াল। মনে হয় বহুদিনের সাধনায় রপ্তকরা প্রচেষ্টার সুফল ফলশ্রুতিস্বরূপ প্রাণপ্রাণে সমস্ত শক্তি একীভূত করে দূর্দমনীয় সাহস অর্জন করে স্খলিত কণ্ঠে আমাকে বলল ‘বাবুরেও লইয়া যাইবেন’? আমি সন্দেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, ‘হ্যাঁ’ ‘তোমার নাম কী বাবা’? ও বলল, ‘রুবেল মিয়া’। আমি বললাম, ‘তুমি’ স্কুলে পড়’? সে বলল, হ্যাঁ’ পড়ি’। আমি বললাম, ‘কোন স্কুলে’? ও বলল, ‘সাভার অধরচন্দ্র হাই স্কুলে’। আমি, বললাম ‘কোন ক্লাসে’? ও বলল, ‘ক্লাস সেভেনে’। আমি বললাম, ‘তুমি’ এ বাড়ির ছেলেদের সাথে খেলা কর না কেন’? ও বলল, ‘এরা বড়লোক’। ‘মায় এদের সাথে খেলতে দেয় না’ প্রত্যুত্তরে আমি ওকে যথেষ্ট অভয় দিয়ে বললাম, ‘তাতে কী, তুমিও তো ওদের মতো স্কুলে পড়ো’।

আমি ছেলেটিকে এবাড়ির ছেলেদের সাথে খেলার ব্যবস্থা করে দিতে চাইলেও সে কখনো খেলতে চাইত না। একদিন আমি ও আমার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আর সেই সাথে এবাড়ির ভাড়াটিয়া কয়েকজনদের নিয়ে পিকনিকে গেলাম। অনেক অনুরোধ উপরোধ করে রুবেল মিয়ার মা’র অনুমতি নিয়ে তাকেও সঙ্গে নিলাম। শর্ত একটাই রুবেল মিয়া যেন খেলাধুলা না করে। কারণ তার ডান পায়ের হাঁটুতে সমস্যা আছে। একবার ক্রিকেট খেলতে গিয়ে তার হাঁটুর হাড় ভেঙে গিয়েছিল। শুধু যে রুবেলের মা তার ছেলের হাঁটু ভাঙার অজুহাতের জন্যেই তাকে খেলতে দেয় না তা কিন্তু নয়। এর নেপথ্যে আরও কাহিনি আছে। যা না বললেই নয়।

রুবেলের নানা বাড়ি ও দাদাবাড়ি মাদারীপুরের কালকিনী উপজেলার কোনো এক গ্রামে। রুবেলের মা আমিনা মোটামুটি ভাল গৃহস্থ বাড়ির সন্তান। আমিনা ভালভাবেই এসএসসি পাশ করে কালকিনী আবুল হোসেন কলেজে ভর্তি হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু তার আর কলেজে পড়া হলো না। প্রেমের টানে সাড়া দিতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় সলিম মিয়ার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। সলিম ছিল হতদরিদ্র ঘরের একজন অশিক্ষিত সুঠাম দেহীর যুবক। আমিনা বেগম একপ্রকার বাবা মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রচণ্ড অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও তার বাবার বাড়ির সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চিরদিনের জন্য রাতের আঁধারে অজানার দেশে পালিয়ে গিয়েছিল। সাভারে এসে আমিনা বেগম ও তার স্বামী একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি নেয়। যোগ্যতানুযায়ী আমিনা কাঁটিং শাখায় হেলপারের চাকরি নেয়। আর সলিম মিয়া সাধারণ শ্রমিকের খাতায় নাম লিখায়। শুরু হলো নুন আনতে পানতা ফুরানোর মতো। দারিদ্রাকীর্ণ যাপিত জীবনের পালাবদলের অনাকাঙ্ক্ষিত পর্ব।

আমিনা তার যোগ্যতায় ভর করে কাটিং মাস্টারের পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। কিন্তু সলিম মিয়া শত চেষ্টা করেও সবক্ষেত্রেই ব্যর্থ

হয়ে মাকাল ফলের নাম ধারণ করল। আগে গ্রামের ফুটবল ম্যাচে হায়ারে খেলতে গিয়ে কিছু উপার্জন করত। কিন্তু এখানে তাও নেই। এখানে সবাই শুধু ক্রিকেট খেলে। ক্রিকেট রাজকীয় খেলা। সে এখানে নিতান্তই অপাংক্তেয়। আর যায় কোথায়? দারিদ্র্যের দশ মুখ স্বামী স্ত্রীতে প্রায় মনোমালিন্য আর ঝগড়াঝাটি শুরু হয়। আমিনা তার ছেলেকে কিছুতেই খেলাধুলা করতে দিবে না। তার মামাদের মতো অনেকগুলো পাস দিয়ে তাকে বড়ো চাকুরে হতে হবে। একেবারে ধুনুর্ভঙ্গপণ। যার ফলশ্রুতিতে রুবেল মিয়া। কারও সাথে খেলা করে না। অথচ সে পিতার মতোই খেলাধুলায় একেবারেই পাক্কা পেওয়ার। কিন্তু বিধিবাম, তার মা একেবারেই নেতিবাচক।

আমি একটা বড়ো বারো সিটের মাইক্রোবাস ভাড়া করেছিলাম পিকনিকে যাব বলে। গন্তব্য ছিল দোহারের পদ্মার পাড়। জুলাভাতি পার্টি সমভিব্যহারে দোহারে পদ্মার পাড় মৈনট রির্সোটে। আমাদের গাড়ি কলাকোপা বান্দুরা হয়ে মৈনট ঘাটে এসে পৌঁছে। আমি নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হলাম। সেই শৈশবে পদ্মার স্টিমার অর্থাৎ রকেট স্টিমার করে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং, ভাগ্যকুল ও জশিলদা হয়ে মৈনট যেতাম। আমার নানাবাড়ি দোহারে। যতই পদ্মার নিকটবর্তী হচ্ছিলাম রুবেল মিয়ার সাথে আমার ততই আন্তরিকতা বেড়ে যেতে লাগল। সেও তার ছোট্ট জীবনের বীরগাঁথা আমার কাছে সোৎসাহে অকপটে নিবেদন করতে থাকল। সে একজন ভাল সাঁতারু। তার গ্রামের আড়িয়াল খাঁ নদীতে জুনিয়র স্কুল প্রতিযোগিতায় একবার সে প্রথম হয়েছিল। ক্রিকেট খেলায় জুনিয়র স্কুল প্রতিযোগিতায় সে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিল। আরও কত কী! সেই ছোট বেলায় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের গল্প পালামৌতে পড়া, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'।

রুবেল মিয়ার মতো পদ্মাপাড়ে এসে আমার মনটা আনন্দোলণ্ডাসে মেতে উঠল। আমিও ওদের সাথে দশ ওভারের একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ খেললাম। রুবেল মিয়া এই ম্যাচে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হলো। আমি রুবেল মিয়াকে বললাম; এই ম্যাচের বিজয়ের ট্রপি হিসেবে তোমাকে আমি সাভার বিকেএসপিতে ভর্তি করিয়ে দেব। সে যারপরনাই খুশি হয়ে বলল, 'তাহলে আমি সাকিব আল হাসানের মতো বিপিএল খেলতে পারব'? আমি বললাম, 'নিশ্চয় কেন নয় সে দারুণ খুশি হয়ে বলল, 'তাহলে তো আমি সাকিব আল হাসান হয়েই যাব'। অনেক টাকা পাব'। প্রত্যুত্তরে আমি ওকে বললাম, 'তুমি এত টাকা দিয়ে কী করবে'? ও বলল, 'আমি আমার গ্রামে একটা বড় স্টিডিয়াম বানামু'। যাতে আমাগো গেরামের হক্কলে ওই স্টিডিয়ামে খেলতে পারে। তারপর একটু সন্দিহান দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে আমাকে বলল, 'আঙ্কেল সত্যিইতো আমি বিকেএসপিতে ভর্তি হইতে পারুম'? আমি তাকে যথেষ্ট সাহস দিয়ে বললাম, 'কেন পারবে না, নিশ্চয় পারবে'। ও অনেকটা হতাশাপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'মায় আমারে খেলতে না দেয়'? আমি বললাম, 'আমি তোমার মাকে সব বুঝিয়ে বলব, যে এখানে খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশুনাও করতে পারবে। তোমার বাবা রাজি তো?' ও উৎসাহ ভরে বলল, 'বাজানতো সবসময় চায় যে আমি বাজানের মতো খেইলা মেডেল জয় করি। 'খালি মায় দেয় না'।

আমার মনে হলো, আমি কত হতভাগা বাবা, রুবেলের বাবার মতোও হতে পারলাম না মনে মনে স্থির করলাম আমি আমার বড়ো ছেলেকে বিকেএসপিতে ভর্তি না করিয়ে যে ভুল করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত করব। আমি রুবেলকে বিকেএসপিতে ভর্তি করিয়ে দিব। আমার মনে এতদিন যাবৎ যে অপরাধবোধ আমাকে নীরব ঘাতকের মতো অনেকদিন ধরে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল বুঝিবা তার কিছুটা হলেও লাগব হবে।

আমরা সবাই মাইক্রোবাসে চড়ে পদ্মার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আর আবৃত্তি করছি 'নমো নমো সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি, গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি'। রুবেল সোলণ্ডাসে নাচতে নাচতে যখন মাইক্রোতে উঠতে যাচ্ছিল বুঝিবা তার মায়ের সম্মতিটা পেতে বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। তার আর কিছুতেই তর সইছিল না। পড়ালেখা যখন করা যাবে তখন মা নিশ্চয় সম্মতিটাও তাকে দিয়ে দিবে। ঠিক তখনই একটা অঘটন ঘটল, গাড়িতে উঠতে গিয়ে তার যে পায়ে ব্যথা ছিল সে পাটি হঠাৎ ফসকে যায়, ফলে সে মাটিতে পড়ে গেল। আমরা তাকে দোহার উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। ডাক্তার বলল, 'ঢাকায় নিয়ে গিয়ে ভলে আর্থোপেডিক ডাক্তার দেখাতে হবে'। আজকের সব আনন্দই হরিষে বিষাদ।

আমরা যথারীতি সাভারে ফিরে এলাম। সমস্ত ঘটনা আদ্যন্ত জেনে রুবেলের মা অগ্নিশর্মা কণ্ঠে আমাকে বলল, 'যা মনে করছিলাম তাই অইলো'। আপনে আমার পোলাডারে শেষ কইরা ফেললেন। আর এহেনে থাকন যাইবো না। এইহানে থাকলে আপনের কুসংসর্গে আমার পোলাডা শেষ অইয়া যাইবো। অর বাপের মত অশিক্ষিত বলদ অইবো।'

আমি রুবেলের সমস্ত সমস্যা সমাধানের দায়ভার গ্রহণ করব বলে শতকোটিবার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা নিতান্তই তপ্ত কড়াইতে এক ফোঁটা ব্যর্থ জলোচ্ছ্বাসের মতই মনে হলো।

সপ্তাখানেক পরে জানলাম আমিনা বেগম তার পরিবারবর্গ নিয়ে সাভারের আড়পাড়ায় অন্যত্র ভাড়া বাড়িতে চলে গেছে। বিপদের ঘনঘটা এখানেই শেষ নয় আমিনা তার স্বামী যে গার্মেন্টসে চাকরি করত সেখানে আগুন লেগেছিল। অনেক মালামাল আগুনে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে গেছে। সেই আগুনের অদৃশ্য লেলিহান শিখা আমাকেও বুঝিবা স্পর্শ করল। আমার স্বপ্নের অবসান হল। রুবেলকে আর বড় আর্থোপেডিক ডাক্তার দেখানো হলো না। সাকিব আল হাসান বানানো গেল না! আমার প্রায়শ্চিত্ত করার শেষ সুযোগটাও নষ্ট হয়ে গেল। আমার ছেলে বোধহয় আমাকে আর ক্ষমা করবে না। এখনো শ্বশুরবাড়ি থেকে ঢাকায় যাবার সময় আর সেই মাঠটির দিকে চেয়ে দেখি না। সেই মাঠটিতে এখনও কত ছেলেরা খেলা করে কিন্তু রুবেলের মতো কেউ আর আমার কাছে এসে কখনো বলে না 'বাবুরেও লইয়া যাইবেন'।

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

জীবনের আলোছায়া

রুনা তাসমিনা

মসজিদ থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টার শব্দ। সাথে সাথে ঘেউ ঘেউ করে উঠল বাড়ির কুকুরগুলোও। প্রতিদিন ভোররাতে সেহরির সময় এদের চিৎকারেই ঘুম ভাঙে সালেহার। হাতের উপর ঘুমোতে থাকা ছোটো ছেলের মাথাটা পাটিতে নামিয়ে দিয়ে উঠে বসলো ঘরের মেঝেয় বিছানো পাটির ওপর। তেলহীন, রুক্ষ খোলা চুল হাতে পেঁচিয়ে খোপা করে নেয়। ফিকে অন্ধকারে তাকায় পাটিতে ঘুমিয়ে থাকা ছেলেমেয়েদের দিকে। রবি ঘুমায় বাপের সাথে চৌকিতে। ভাঙা খুঁট রশি দিয়ে বেঁধে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে কোনোরকমে দাঁড় করিয়ে রাখা ঘরের একমাত্র আসবাব। ছেঁড়া মলিন শাড়িটি গায়ে জড়িয়ে ভারী শরীর নিয়ে এগিয়ে যায় রান্না ঘরের দিকে। মাটির হাঁড়ি থেকে চাল নিতে গিয়ে দেখে, নারকেলের শুকনো খোলসটির দুখোলসও হয়নি! এই অল্প চালের ভাতে পেটভরে খাওয়া কারোরই হবে না। মিনু, বেনুর জন্যেও কিছুটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে দুপুরে খাওয়ার জন্য। ওরা রোজা রাখে না। শুধু শুক্রবারে রোজা রাখে। কাল শুক্রবার না। গরিব মাইনষের বাচ্চাদের পেট কি বেশি বড়ো অয়! নইলে এত ভাত খায় কেমনে! ধুত্তরি! কিসব আজাইরা প্যাঁচাল মাথায় আইতাছে! নিজের উপর বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে গেল সালেহার। চার ছেলেমেয়ের সবাই পিটেপিটি ভাইবোন। আরো একজন আসার বেশি দেরি নেই। দুই আড়াই মাস পর আরো একজন যোগ হবে পরিবারে। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চালগুলো তুলে নেয় বেতের ঝুড়িতে। জমির সাহেবদের দোতলা বাড়ির ছাদের উপরে বড়ো একটা বিদ্যুতের বাল্ব জ্বলে। সে বাতির আলো ওই বাড়ির চারপাশ আলোকিত করে রাখে। তার আলো এসে পড়ে সালেহাদের ঘরের আশপাশেও। ওই আলোতেই সে রাতে বাইরের যাবতীয় কাজ সারে। বাড়ির পেছনের পুকুরে গিয়ে হাত মুখ ধোয়, চাল ধুয়ে আনে ঘরে।

চেরাগের সলতেটা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে দুই মুখী চুলার একটিতে ভাতের চাল বসিয়ে দিয়ে অন্যটিতে বসায় রান্না করা বাসি তরকারি। চেরাগের কেরোসিন একেবারে তলায়। একটু পর থেকে শুধু সলতেটাই পুড়বে। এর মধ্যেই শেষ করে নিতে হবে খাওয়া। কিন্তু হিসাবে মিলল না। ভাঙা পাটিটা বিছিয়ে ঘরে যে দু'তিনটা বাসন আছে ওগুলো পাটির উপর বিছিয়ে রাখতেই বাতিটা দপ দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেলো চেরাগ। অভাবীদের কথা কেউ বোঝে না বাতিটার দিকে তাকিয়ে ভাবে। একেতো পোয়াতি শরীর, তার ওপর এই জ্বালা। চরম বিরক্তিতে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে, তুঁই হরি হরি গুম যও আর তামসা চ। বেডার দুই হইসা কামান'র মুরদ নাই, আবার ঘুম। চেরাগের তেল শেষ অই গেছে। এংঙ্গা আঁই কি করমু?

রাগে গজ গজ করছে সালেহা। কলিম অভ্যস্ত এসব শুনে শুনে। বিছানা থেকে ঘুম জড়ানো গলায় কলিম বউকে বলে,

পোঁয়াইত্তে রাতিয়ে আর ন চিল্ল না। আইজ্জা জমির সাবরা বেগগুনুরে যগত দিবু। টিয়াঁ হাইলে ঈদের বাজার হুদ্দা হরি লই আইন্নুম।

কলিমের শান্ত্বনায় সালেহার রাগ আরো বাড়ে।

মাইনষেত্তুন চাই চাই কদিন চইলব? বাপের জমিদারি ত বেচি খাইচত। বেড়া নিজে চইলত হারে না, তার উচে বছর বছর হোলা ছাড়া লই লই হুরাইতে লাইচে।

কথাটা কলিমের মনে আঘাত করে সালেহা জানে। তবু রাগ উঠলে মুখ সামলাতে পারে না। সালেহার যখন বিয়ে হয় তখন কলিমের টাকা কড়ির অভাব ছিল না। দুরারোগ্য রোগে মা যখন মারা যায়, কলিম তখন এইটে পড়ে। বড়ো দুই ছেলে বাপের জমিতে হাল চাষ করে। মায়ের শখ ছিল কলিম লেখাপড়া করবে। বুড়ো বাপও চাইতো কলিম মায়ের ইচ্ছে পূরণ করুক। কিন্তু ভাই, ভাইবৌ কেউ চায়নি সে পড়ালেখা করুক। ভাইদের মতো জমিতেই হাল ধরুক।

টিফিন ছুটিতে স্কুল থেকে এসে দুপুরে ভাত খেতে বসলে ভাইয়ের বউদের বিরক্তি, খোঁচা মেরে কথা বলা সবই বুঝতে পারে সে। বুঝতে পারে এদের সংসারে সে একটি বোঝার মতো। মায়ের অভাব মনের মধ্যে পীড়া দেয় সারাক্ষণ। এসব থেকে দূরে সরে থাকার জন্য স্কুল কামাই করতে করতে একসময় ছেড়ে দেয় পড়াশোনা। হাটে বাপের মুদি দোকান আছে। সেখানেই বসে বাপের কাজে সাহায্য করে। বাপ বুঝতে পারে তাই প্রথম দিকে স্কুল বন্ধ করা নিয়ে একটু আপত্তি করলেও পরে আর কিছু বলেনি। কোনো কোনো দিন বাজারে যে বিশাল বটগাছটি আছে ওটার শেখড়ে বসে আড্ডা দেয় সমবয়সি ছেলেদের সাথে। একদিন বাপে ডেকে বলল,

কলিম, তুই বিদেশত যাইবি? আঁই একজনরে চিনি। হে বন্দোবস্ত গরি দিতে হাইরব। যাইবি?

বাপের দোকান, হাটের আড্ডা ফেলে দূরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। আবার ঘরের কথা চিন্তা করলে তিক্ত হয়ে ওঠে মন। তাই বাপের

কথায় রাজি হয়। এ জমি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে বুড়ো বাপ। বড়ো ছেলেরা রাজি ছিল না। তবু বাপ শোনেনি তাদের কথা। বাপের চেনা সেই লোক সব বন্দোবস্ত করে দেবে বলে সেই যে টাকা নিয়ে গিয়েছিল, আর কোনোদিন তাকে গ্রামের আশপাশেও দেখা যায়নি। লোকটি টাকা নিয়ে উধাও হওয়ার পর বাপের উপর নেমে আসে বড়ো দুই ছেলের কথার নির্যাতন।

হেরে তো আঙুগুত্তনে বেশি দেইত হাইরগু। অ'নে বুজ অবস্তা? আঁরার হক হেতেরে দিয়ারে কি লাভ অইল? টিঁইয়াগুন হানিত হালায় দিলা!

তীরের ফলার মতো বুকে বিঁধে সেসব কথা। নিজের চোখের পানি গোপন করে শান্ত্বনা দেয় কলিমকে। বৃদ্ধ, শান্ত মানুষটি মনে হয় বুঝতে পেরেছিল দিন শেষ হয়ে এসেছে। মারা যাওয়ার আগে তিন ভাইকে জমি জিরেত ভাগ করে দেওয়ার সময় কলিমের ভাগে একটি জমি কম। ভাইরা তাদের হিসাব কড়ায় গণ্ডায় বাপের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে চলে যায় যার যার কাজে। ওরা চলে যাওয়ার পর বিছানার তলা থেকে টিনের বাক্সটি বের করে একটা পুঁটলি কলিমের হাতে দিয়ে বলে,

তর মায়ের কিচু সোনার গয়না। তোগো তিন ভাইয়ল্লাই ভাগ করি রাখছিল। তর ভাগেরডা হিয়ানে তুইল্লা রাখছিলাম। আইজ বুইজ্জা ল বাজান। বিয়া বইলে বউয়েরে দিচ।

মায়ের সেই গয়নায় সাজিয়ে সালেহাকে বউ করে আনে কলিম। মুদি দোকানের ভাগও হয়েছিল। ভাইদের কাছে দোকানের অংশ আর নিজের ভাগের একটি জমি বিক্রি করে বেশ আড়ম্বর করেই বিয়ে করেছিল। তখন সালেহা বুঝতে পারেনি। বাপের রেখে যাওয়া জমি ছাড়া আর কোনো সম্বল তার স্বামীর নেই। বুঝার কথাও নয়। বিয়ে বাড়ির সব খরচ কলিমের টাকায় চলছে, তাই ভাই ভাইবৌ খুশি। সাতদিনের দিন সালেহা যখন বাপের বাড়িতে ফিরে গেল, গয়না গাটিতে মোড়ানো বাড়ির মেয়ে বউরা সালেহাকে দেখতে এসে বলাবলি করে,

তর ত কপাল খুইলচে সালেহা! এত্ত ভালো গরে বিয়া অইছে! হারা জীবন সুক্কুত থাইকবি।

সালেহা পরনের শাড়িটা ব্লাউজের সাথে গুঁজে দেয় আরেকটু। সোনার হার ঝিলিক দিয়ে ওঠে গলার অংশে। ঘোমটা ফেলে রাখে যাতে কানের ঝুমকাও দেখা যায়। মেয়ের সুখ দেখে খুশি বাপের বাড়ির সবাই। দিন সাতেক পরে যখন আবার ফিরে এলো শ্বশুরবাড়িতে ঘরের পাল্টানো অবস্থা দেখে স্তম্ভিত সালেহা! কলিমদের বাপ-দাদার আমলের দোচালা মাটির ঘরটি তিনভাগে ভাগ হয়েছে। কলিমের ভাগে পড়ে দক্ষিণ দিকের অংশ। কলিম সালেহাকে নিয়ে সে ঘরেই ওঠে। ভাইবৌরা এসে সালেহাকে কলিমের ভাগের হাঁড়ি পাতিলসহ বাপের আমলের জিনিষপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বলে,

বুজি ল তঁর সংসার। আইজ্জাত্তুন যার যার সংসার হেই সামাল দিব। তুঙ্গু ত কুনু চিন্তা নাই। জমিন বেইচ্যা কলিম কাঁচা টিঁয়া লই আইবো তোঁয়াল্লাই।

এই খোঁচা সালেহা না বুঝিলেও কলিমের বুঝতে অসুবিধা হয়না। আসবাবপত্রের মধ্যে ভাগে পায় এই একখানা চৌকি। কলিম জানে ভাইয়েরা তাকে ঠকিয়েছে। তবু কিছু বলে না। সেদিন থেকে শুরু হয় সালেহার সংসার। দিনের পর দিন ঘুরে ফিরে সময় কাটাতে দেখে সালেহা বুঝিতে পারে ভাইবৌদের খোঁচা। বছর দেড়েকের মাথায় আসে প্রথম সন্তান। এর মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে আরো জমি। সালেহা অনেক বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিল হাটে একটি দোকান নেওয়ার জন্যে। শেষ জমিটি বিক্রি করে বউয়ের কথা শুনেছিল। কিন্তু এতগুলো বছর ঘুরে ফিরে কাটানোর কারণে মন বসে না দোকানে। ভাড়ায় দিয়ে দেয় সেটিও। এখনো খুড়িয়ে খুড়িয়ে সংসারটা চলছে সেই দোকানের ভাড়ার টাকায়। সালেহা দিন গুনতে থাকে মাস শেষের।

মাসের মাঝামাঝিতে দোকান থেকে টাকা আসার আশাও নেই। সলতে বাড়িয়ে দিয়ে চেরাগ ধরিয়ে নিয়েছে আবার। কাঠের পিঁড়িতে বসে একদৃষ্টিতে পুড়তে থাকা চেরাগটির দিকে তাকিয়ে ভাবে,

কাইল জমির সাবরা যগত দিবু ত? যুদি ন দেয় কি গরি চইলব?

ভাতের ফেন উপচে পড়তেই ছেদ পড়ে ভাবনায়। ডাকনাটা তুলে চুলার পাশে নামিয়ে রাখে। ডাক দেয় মিনু, বেনু, রবি, সুজনকে হাত মুখ ধুয়ে খেতে আসার জন্যে। কিছুক্ষণ পর পর সলতেটা বাড়িয়ে দিয়ে এখনো জিইয়ে রেখেছে চেরাগটি। ভাত খেতে খেতে কলিম বলে,

যগত লইতে আঁরা বেগগুন যাইমু। তাইলে বেশি টিঁয়া হাওন যাইবু। দোয়ানিরে কইচি এইবার য্যান টিঁয়া কিচু বারাইয়া দ্যায়। ঘরের চালডা ঠিক করন লাইগবু।

সালেহা তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে। প্রতিবছর রোজার ঈদে জাকাতের টাকা আর দোকানির টাকায় সে চালার টিন ঠিক করবে বলে। কিন্তু দেখা যায় ছেলেমেয়েদের আবদারের এটা সেটা, ঈদ উপলক্ষে ঘরে ভালো কিছু রান্না হবে, সেই সরঞ্জাম কিনতে কিনতে টাকা কখন শেষ হয়ে যায়। এই একটা সময় সালেহার, কলিমের ওপর কোনো রাগ হয় না। ঈদের দিন ছেলেমেয়েরা যখন নতুন জামা পরে হাসি মুখে মা'কে সালাম করতে আসে, খুশিতে বুক ভরে যায় সালেহার। আজও যখন কলিম কথাগুলো বলছে সালেহা চুপচাপ শুনে যায় কোনো উত্তর না দিয়ে। কিন্তু এটাও জানে এবার চালার একটা ব্যবস্থা না করলে সামনের বর্ষায় ঘরে থাকা, বাইরে থাকা সমান হয়ে যাবে।

চালার টিনগুলো কলিমের বাপের লাগানো। জং ধরে ফুটো হয়ে গেছে অনেক জায়গায়। বর্ষার সময় সেই ফুটো দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে সারা ঘরে কাদা হয়ে থাকে। দুই মেয়েকে নিয়ে সালেহা পানি পড়া জায়গাগুলো আবার লেপে দেয়। কলিম বাজার থেকে প্লাস্টিকের টুকরো খুঁজে এনে ফুটোগুলো বন্ধ করে। কিন্তু মুষলধারায় বৃষ্টি নামলে বন্ধ ফুটো চুইয়ে পড়তে থাকে পানি।

কুকুরগুলো আবার ঘেউ ঘেউ করছে। সালেহা ঘর থেকে গাল পাড়ে,

দূর হ বালাই। হিঁয়ানে কিল্লাই ঘেউ ঘেউ করস।

মসজিদ থকে ভেসে আসছে ফজরের আজানের শব্দ। বিছানায় শুয়েও কলিমের চোখে ঘুম নেই। সালেহাও জেগে। অপেক্ষা ভোরের। কখন এগারোটা বাজবে!

মানুষের ঢল নেমেছে জমির সাহেবদের বাড়ির উঠোন, কাচারি ঘর ছাড়িয়ে আশপাশের সব জায়গায়। একজায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না কোনোভাবে। কলিম ঠেলেঠুলে জায়গা করে মেয়ে দুটোকে মেয়েদের সাথে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে দাঁড়ালো কাছাকাছি জায়গায় ছেলেদের নিয়ে। মাইকে বার বার বলছে ধাক্কা ধাক্কি না করার জন্যে, সবাই যাকাত পাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! সবাই আগে ভাগে নিয়ে নিতে চায়। হঠাৎ পেছন থেকে অনেক মানুষের চাপ একসাথে গায়ের ওপর এসে পড়ে। মানুষের চিৎকার চেঁচামেচিতে কলিম শুনতে পায়, ছেলেদের ভয়ার্ত স্বর,

বাজান, তুমি কই, আমাগোরে জলদি উঠাও!

কলিম হাতড়ায়। খুঁজে পায় না ছেলেদের হাত। দিনের আলো হঠাৎ নিভে যায় কিছু বুঝে ওঠার আগে। জমির সাহেবের বাড়ির চারপাশ ভারী হয়ে ওঠে মানুষের আর্তনাদে। খুশির ঢেউ পরিণত হয় স্বজন হারানো কান্নার রোলে।

সালেহার মতো অনেকেই খুঁজছে স্বজনকে। এর মধ্যেই অনেককে সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সারাদিন এর ওর কাছে পাগলের মতো ঘুরেছে। স্বামী সন্তানের খোঁজে। কেউ কিছু বলতে পারছে না। টলতে টলতে ঘরে ফিরে আসে। ঘরে ঢুকেই দেখে দুই মেয়ে ঘরের মেঝেতে বসে আছে। আতঙ্কে গুঁটিসুটি মেরে। সালেহা জড়িয়ে ধরে দুই মেয়েকে।

ও মা! তরা আইচত! তোর বাজান, রবি সুজনে কই? হেগোরে আনস নাই?

মাকে দেখে হুঁস ফিরে আসে যেন দুই মেয়ের। ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। বুকফাটা চিৎকারে সালেহা উপরের দিকে দুই হাত তুলে ফরিয়াদ কাঁদে।

ও আল্লারে। আঁর ঈদের কাপড়চোপড় কিছু লাইগদুনু। ঘরের চাল ঠিক দহরে। লাইগদুনু। তুঁই শুধু আঁর জামাই আঁর পোলা ছাবারে হিরাধরে।

আরেকজন অনাগত মায়ের শরীরের ভেতরেই হয়ত গুমরে কাঁদে।

শিক্ষা ও গবেষণায় সহযোগিতার আশ্বাস রাষ্ট্রপতির

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কাজের উন্নয়নসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ। ৪ঠা আগস্ট বঙ্গভবনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (দায়িত্বপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. শিরীন আখতারের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান শিক্ষা গবেষণার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ও পরিবেশের কথা জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৩শে আগস্ট ২০১৯ বঙ্গভবনে শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন–পিআইডি

সংযম ও ত্যাগের মানসিকতায় উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, ঈদুল আজহা আমাদের মাঝে আত্মদান ও আত্মত্যাগের মানসিকতা সঞ্চারিত করে, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়ার মনোভাব ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। কোরবানির মর্ম অনুধাবন করে সমাজে শান্তি ও কল্যাণের পথ রচনা করতে আমাদের সংযম ও ত্যাগের মানসিকতায় উজ্জীবিত হতে হবে। পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ১১ই আগস্ট দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

ডেঙ্গুর সঙ্গে বানভাসী মানুষেরও পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি সামর্থ্যবানদের বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ১২ই আগস্ট পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বঙ্গভবনে দেওয়া এক বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, সচেতনতার মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সম্ভব। এডিস মশার বিস্তার রোধে দুষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে দেশবাসীর সহযোগিতা প্রয়োজন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বন্যা ও ডেঙ্গুর কবল থেকে শিগগিরই মুক্তি পাবে দেশবাসী। এছাড়া কোরবানির বর্জ্য নিজ দায়িত্বে অপসারণের আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, সমাজের প্রতিটি স্তরে কোরবানির শিক্ষা কাজে লাগাতে হবে। কোরবানির মর্ম অনুধাবন করে সমাজে ন্যায়বিচার, শান্তি ও সমতা প্রতিষ্ঠায় সংযম ও ত্যাগের মানসিকতায় উজ্জীবিত হতে হবে।

জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সবাইকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৪ই আগস্ট দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, '১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূসহ নিকটাত্মীয়রা শাহাদতবরণ করেন। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে সব শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

উন্নয়ন অগ্রগতি অর্জনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কাজে লাগান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে দেশের বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কাজে লাগাতে সব ধর্মের অনুসারীদের প্রতি আহ্বান জানান। ২৩শে আগস্ট 'শুভ জন্মাষ্টমী' উপলক্ষে বঙ্গভবনে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমানকাল থেকে এদেশে সব ধর্মের অনুসারীরা সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে আসছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সমুহান ঐতিহ্য। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ ঐতিহ্য অব্যাহত রেখে জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে তা কাজে লাগানোর জন্য দেশের সব ধর্মালম্বীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে আগস্ট ২০১৯ শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলনকক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কারে ভূষিত

বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচিতে ব্যাপক সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার দিয়েছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এবং ইমিউনাইজেশন-জিএভিআই। প্রধানমন্ত্রী এ পুরস্কার দেশবাসীকে উৎসর্গ করেছেন। নিউইয়র্কে ২৩শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দপ্তরে 'ইমিউনাইজেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বীকৃতি' অনুষ্ঠানে গত ৫ বছরের সব জেলায় ভ্যাকসিনের কভারেজ বেড়ে হয়েছে ৮২ শতাংশের বেশি এবং নির্যাতনের মুখে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১১ লাখ রোহিঙ্গার মধ্যেও টিকাদান কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

রপ্তানির জন্য কার্গো প্লেন কেনার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে আগস্ট শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় ৩ হাজার ১৬৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ১২ প্রকল্পের অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সবজি চাষে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। প্রচলিত কৃষির বাইরে বিদেশি জাতের বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ফল-ফুল চাষ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সবজি রপ্তানির জন্য দুটি কার্গো প্লেন কিনতে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

বিদেশ যাত্রায় প্রতারণা ঠেকাতে নজরদারির নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে আগস্ট প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬-এর আলোকে গঠিত অভিবাসন বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশি বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে অবস্থান করে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে– যা আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। এলক্ষ্যে বিদেশে যাওয়ার সময় সাধারণ জনগণ যেন প্রতারিত না হয়, অকালে হারিয়ে না যায়। সেজন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি নজরদারি জোরদারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এ বিষয়ে মিডিয়াকেও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

আকাশ পথে পরিবহণ (মন্ট্রিয়ল কনভেনশন, ১৯৯৯) আইন, ২০১৯-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন

আকাশ পথে যাত্রী ও তার মালামালের সুরক্ষায় মন্ট্রিয়ল কনভেনশন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়ে 'আকাশপথে পরিবহণ (মন্ট্রিয়ল কনভেনশন, ১৯৯৯) আইন, ২০১৯-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। ২৬শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেন। এ আইনের মাধ্যমে উড়োজাহাজে ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনায় কোনো যাত্রীর মৃত্যু হলে বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে, ব্যাগেজ পেতে দেরি হলে, হারিয়ে গেলে বা ক্ষয়ক্ষতি হলে, কার্গো পেতে দেরি হলে, হারিয়ে গেলে প্রতিকার পাওয়া যাবে। এছাড়া দুর্ঘটনায় যাত্রীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ আইনের আওতায় প্রথম ধাপে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ হবে ১ লাখ ৬০ হাজার ডলার।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

অকুতোভয় সংগ্রামের এক অনন্য উদাহরণ জাতির পিতার জীবন

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ জাতির পিতার জীবনকে অকুতোভয় সংগ্রামের এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৮ই

আগস্ট রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড আয়োজিত সভায় প্রধান আলোচকের বক্তব্যে জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি একথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্য কুশীলবদের বিচারের জন্য একটি কমিশন গঠন এখন সময়ের দাবি বর্ণনা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিচার এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ পলাতক খুনি ও বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের কুশীলবদের বিচার এখনো হয়নি। এজন্য একটি কমিশন গঠন

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৮ই আগস্ট ২০১৯ তথ্য ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোনাজাতে অংশ নেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্য সচিব আবদুল মালেক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জাকির হোসেন ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মো. নিজামুল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

করে বিচার সম্পন্ন হলে তা ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদাহরণ হয়ে থাকবে।

স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে ড. হাছান মাহমুদ আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর দেওয়া স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ হান্নান। তারপর তারা একজন সেনা অফিসার দিয়ে ঘোষণা পাঠ করানোর জন্য জিয়াকে পাঠ করতে দেন। তিনি সেটা চার দেয়ালের মধ্যে পাহারায় থেকে পাঠ করেছিলেন আর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ অফিসের কর্মচারী নূরুল হক জীবন বাজি রেখে ২৬শে মার্চ সারা চট্টগ্রাম শহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা রিকশায় মাইকিং করেন।

নারীর ক্ষমতায়নে আরো বেশি ভূমিকা রাখতে হবে

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, জীবন হচ্ছে বাইসাইকেল চালানোর মতো। সাইকেল চালাতে যেমন ভারসাম্য রাখতে হয়, জীবনে সফল হতে হলেও তেমনি সব কিছুতে ভারসাম্য থাকা চাই। চলার পথে জীবনকে যুদ্ধক্ষেত্র মনে করতে হবে। নিজের স্বপ্ন ঠিক করে তা বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে হবে। সফলতা একদিন ধরা দেবেই। ৮ই আগস্ট চট্টগ্রামে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন (এইউডব্লিউ) আয়োজিত ম্যাথ অ্যান্ড সায়েন্স সামার স্কুলের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইম্যান বাংলাদেশের গর্ব উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে অবিশ্বাস্য কাজ করছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন। যারা এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো বিশ্বমানের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে তারা ভাগ্যবান। সবাই একদিন স্বপ্নের চেয়েও বড়ো হবে এবং নারীর ক্ষমতায়নে আরো বেশি ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও এখন অনেক সন্তান বাবা-মাকে অবহেলা করে। তাদের সেবা করে না। নির্যাতন করে। ফলে পারিবারিক বন্ধন নষ্ট হচ্ছে। সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এসব বন্ধ করতে হবে। তবেই শান্তি ফিরে আসবে। এ বিষয়ে সরকার ইতোমধ্যে সংসদে আইন পাস করেছে। আইনের বাস্তবায়নও আমরা করব।

বঙ্গমাতার অবদান যথাযথভাবে তুলে ধরার আহ্বান

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনসহ দেশমাতৃকার জন্য বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অবদান যথাযথভাবে তুলে ধরতে গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ৭ই আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। তিনি এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকার সময় দলকে সঠিক সিদ্ধান্তে পরিচালিত করে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন বঙ্গমাতা।

সভায় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বলেন, বিশ্বের সকল কল্যাণের অর্ধেক নর আর অর্ধেক নারীর অবদান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির পিতা হয়ে ওঠার পেছনেও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অবদান কখনো ভুলবার নয়।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

১লা সেপ্টেম্বর: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রপ্তানিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, রপ্তানি বাড়ানোর জন্য নতুন বাজার ও পণ্য বহুমুখীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করতে কাজ করে যাচ্ছে। 'সরকার নতুন পণ্য নতুন দেশ' স্লোগানকে সামনে রেখে রপ্তানি বাড়াতে চায়

৬৮ সংস্থার অলস অর্থ জমবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে

২রা সেপ্টেম্বর: সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে ৬৮ সংস্থার অলস অর্থ জমবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। এ টাকা সরকারের চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করা হবে। এমন বিধান রেখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করে সরকার। এছাড়া বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ করপোরেশন (বিআরটিসি) আইন ২০১৯-এর খসড়াও অনুমোদিত হয় বৈঠকে

ভারতে বিটিভির সম্প্রচার শুরু

বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার ভারতে শুরু হয়। ভারতের রাষ্ট্রীয় চ্যানেল দূরদর্শন ডিটিএইচের মাধ্যমে বিটিভির রামপুরা ভবন থেকে সম্প্রচার কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ

একনেক বৈঠক

৩রা সেপ্টেম্বর: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে ছয় হাজার ৩২৬ কোটি টাকা ব্যয়ের মোট ১০টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত

৮ই সেপ্টেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'বহু ভাষায় সাক্ষরতা, উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা'

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস'। এ বছর দিবসটির

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিতে অংশ নেন–পিআইডি

প্রতিপাদ্য ছিল– 'দীর্ঘমেয়াদি ব্যথায় ফিজিওথেরাপিই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন প্রধান চিকিৎসা'

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৯ই সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯'-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়া সভায়

'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ করপোরেশন আইন ২০১৯'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদিত হয়

পবিত্র আশুরা পালিত

১০ই সেপ্টেম্বর: যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পবিত্র আশুরা পালিত হয়

আন্তর্জাতিক আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস'। দিবসটির এবারের স্লোগান ছিল– 'আত্মহত্যা প্রতিরোধে একযোগে কাজ করা'

কমিউনিটি ব্যাংকের বাণিজ্যিক কার্যক্রম উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

১১ই সেপ্টেম্বর: গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পুলিশের কমিউনিটি ব্যাংকের বাণিজ্যিক কার্যক্রম উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের স্বার্থে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

কুমারী নয় অবিবাহিত, ছেলেদের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যযুক্ত

মুসলমানদের বিয়ের কাবিননামা হিসেবে নিকাহনামার ফরমে কুমারী শব্দটি বিলোপের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ঐ ফরমের পাঁচ নম্বর কলামে কন্যার ক্ষেত্রে কুমারী শব্দের পরিবর্তে অবিবাহিত শব্দটি যুক্ত করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে ছেলেদের ক্ষেত্রে 'বিবাহিত', 'বিপত্নীক' ও 'তালাকপ্রাপ্ত' কি না তাও ঐ ফরমে যুক্ত করতে বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত এক রিট আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ ২৫শে আগস্ট এ রায় দেন।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯-এর বিধি ২৮(১)(ক) অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রারি বহির পাঁচ নম্বর কলামে বলা হয়েছে: কন্যা: কুমারী, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্ত নারী কি না? এমন তথ্য বিবাহের সময় উল্লেখ করতে হয়। বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় এটা একজন বিবাহ উপযুক্ত নারীর জন্য অসম্মানজনক উল্লেখ করে ২০১৪ সালে হাইকোর্টে রিট করেন মানবাধিকার সংগঠন নারী পক্ষ, ব্লাস্ট ও মহিলা পরিষদ।

রিটে বলা হয়, মুসলিম বিয়েটা হচ্ছে এক ধরনের চুক্তি। চুক্তি অনুযায়ী দুজন সাক্ষীর সামনে দুজন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যেহেতু অনেক সময় বিয়েটা অনেকে অস্বীকার করে সেই কারণে বিয়েতে রেজিস্ট্রেশনের প্রশ্ন এসেছে এবং সেই প্রশ্নে এই বিবাহ ফরম তৈরি হয়েছে। আজকে একবিংশ শতাব্দীতে একটা মেয়ে কুমারী থাকল কী থাকল না এটা খুবই অসম্মানজনক। সিডও সনদে সরকার স্বাক্ষর করেছে নারী-পুরুষের সমতার প্রশ্নে। সেখানে কাবিননামায় বিয়ের শুরুতেই আমাদের অধিকার খর্ব হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের কলাম যুক্ত হওয়া সংবিধানের ২৭, ২৮, ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বৈষম্যমূলক ও সংবিধান পরিপন্থি।

যত খুশি তত কথা

বিটিসিএল টেলিফোন (ল্যান্ডফোন নামে পরিচিত) সেবা আরও জনবান্ধব করতে মাসিক লাইনরেন্ট বাতিল করা হয়েছে। এখন থেকে মাসে ১৫০ টাকায় বিটিসিএল থেকে বিটিসিএলে যত খুশি তত মিনিট কল করা যাবে। এছাড়া, বিটিসিএল থেকে অন্য যে-কোনো অপারেটরে (মোবাইল ফোন অপারেটর ও পিএসটিএন) কলচার্জ ৫২ পয়সা মিনিট নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৭ই আগস্ট ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সংক্রান্ত এক বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির সর্বশেষ মাসিক লাইন রেন্ট ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১৬০ টাকা, অন্য জেলা শহরে ১২০ টাকা এবং উপজেলায় ৮০ টাকা ছিল।

নগদ প্রণোদনার নীতিমালা জারি

প্রবাসী আয়ে ২ শতাংশ নগদ সহায়তা দিতে নীতিমালা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ফলে এখন থেকে যারা আয় পাঠাবেন, তাঁদের সুবিধাভোগীরা ২ শতাংশ বেশি টাকা পাবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ৬ই আগস্ট এ নীতিমালা জারি করে কার্যকর করার জন্য ব্যাংকগুলোর কাছে পাঠিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা দিতে বিলম্ব বা হয়রানি করা হলে ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

ডেঙ্গুজ্বরের সমাধান খুঁজতে জাতিসংঘ দল ঢাকায়

এডিস মশার উপদ্রবের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজতে ২১শে আগস্ট জাতিসংঘের একটি বিশেষজ্ঞদল তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসে। এই বিশেষজ্ঞদলে জাতিসংঘের অধীন তিনটি সংস্থা আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রতিনিধিরা আছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, বাংলাদেশে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনোলজি (এসআইটি) ব্যবহারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখাই এই বিশেষজ্ঞ দলটির সফরের প্রধান উদ্দেশ্য।

জানা যায়, এসআইটি একটি পরিবেশবান্ধব কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ কৌশল। এ প্রক্রিয়ায় গামা রশ্মি প্রয়োগ করে পুরুষ এডিস মশাকে বন্ধ্যা করা হয়। এরপর সেই মশাগুলোকে এমন এলাকায় অবমুক্ত করা হয়, সেখানে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব আছে। বন্ধ্যা পুরুষ এডিস মশা স্ত্রী মশার সঙ্গে মিলিত হলে স্ত্রী এডিস মশার ডিম বা লার্ভা নিষিক্ত না হওয়ায় মশার সংখ্যা কমতে থাকবে।

জাপানে জনশক্তি আমদানির তালিকায় নবম দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ

জাপানের জনশক্তি আমদানির তালিকায় নবম দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। এতে করে বিনা খরচে জাপান যাওয়ার সুযোগ পাবেন বাংলাদেশের দক্ষ কর্মীরা। আগামী পাঁচ বছরে সাড়ে তিন লাখ বিদেশি কর্মী নেবে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এদেশ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ৫ই আগস্ট ২০১৯ আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ওয়েবসাইট তৈরির জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও মাইটি-বাইটের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, অনেক দিন ধরেই জাপানের কর্মী আমদানির তালিকায় প্রবেশের চেষ্টা করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ জাপান সফরেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

জাপান জনশক্তি আমদানি করে চীন, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম থেকে। এই তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি বড়ো সম্ভাবনা তৈরি করবে বলে মনে করছেন জনশক্তি রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

ফিফা রেফারি হচ্ছেন জয়া-সালমা

প্রত্যেক রেফারিই স্বপ্ন থাকে ফিফার তালিকায় নাম লেখানোর। সেই স্বপ্ন দুয়ার খুলতে যাচ্ছে জয়া-সালমার। দুজনেই হতে যাচ্ছেন ফিফা রেফারি। ২৪শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ফিফার নির্দেশনা অনুযায়ী পরীক্ষা দিয়ে ফিফা রেফারি হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণের সর্বশেষ হার্ডলটা পার হতে পেরেছেন দুজনেই। সবকিছু ঠিক

থাকলে আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে ফিফার তালিকাভুক্ত রেফারি হয়ে যাবেন জয়া ও সালমা। ২০২০ সাল থেকে পরিচালনা করতে পারবেন দেশ-বিদেশে ফিফার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচ।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

মুজিব হান্ড্রেড ওয়েবসাইট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'মুজিব হান্ড্রেড' নামে একটি ওয়েবেসাইট তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিটি বিভাগ। ওয়েবসাইটের জন্য একটি আকর্ষণীয় লোগো তৈরি করতে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

৫ই আগস্ট রাজধানীর আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সভাকক্ষে www.mujib100.gov.bd ওয়েবেসাইটটি তৈরির জন্য আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মাইটি বাইটের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক জানান, ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলেও তাঁর নীতি, আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং দর্শনকে হত্যা করতে পারেনি স্বাধীনতাবিরোধী চক্র। ২০২০ থেকে ২০২১ সাল বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে আইসিটি বিভাগ বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আর মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভূমিকা রাখবে 'মুজিব হান্ড্রেড' ওয়েবসাইট। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের তথ্য এবং জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তথ্য পাওয়া যাবে।

ওয়েবসাইটটি নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সচিব মিজানুর রহমান মিজু এবং মাইটি বাইট-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সারাহ আলী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চালু হলো 'স্টপ ডেঙ্গু' অ্যাপ

ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বাড়াতে ও দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া ডেঙ্গুর ছোবল থেকে মুক্তি পেতে 'স্টপ ডেঙ্গু' নামের মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে সরকার। অ্যাপটির উদ্‌বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। ১৭ই আগস্ট রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় স্কাউট ভবনে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই অ্যাপের উদ্‌বোধন করা হয়। সরকারের পাঁচটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং চারটি সংস্থা একত্রে

কাজ করার চুক্তি করেছে। অ্যাপটি তৈরির কাজ তত্ত্বাবধান করেছে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব)।

ই-ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ বলেন, 'স্টপ ডেঙ্গু' অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে যে কেউ দেশের যে-কোনো স্থানে মশার প্রজনন স্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করতে পারবেন। এর মাধ্যমে পুরো দেশের মশার প্রজনন স্থানের ম্যাপিং তৈরি করা হবে। ফলে সিটি করপোরেশন এবং স্থানীয় সরকার খুব সহজেই কোন এলাকায় কতজন লোক নিয়োগ করতে হবে, তা মশার জন্মস্থানের ঘনত্ব দিয়ে নির্ধারণ করতে পারবে। মশা নিয়ন্ত্রণে কী পরিমাণ ওষুধ দিতে হবে বা ব্যবহার করতে হবে, সে বিষয়টিও জানা যাবে অ্যাপটির মাধ্যমে। একইসঙ্গে পরবর্তী বছরের জন্য আগে থেকে সতর্কতামূলক প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাবে। গুগল প্লে স্টোর থেকে 'Stop Dengue' লিখে অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

উৎপাদনশীলতা পুরস্কার পেল ২৮ প্রতিষ্ঠান

ছয়টি শ্রেণিতে ২৮টি প্রতিষ্ঠান এবার জাতীয় উৎপাদনশীলতা পুরস্কার পেয়েছে। ২৮শে জুলাই শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশে 'ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট ২০১৮' বিতরণ করেন। এ সময় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

ন্যাশনাল প্রডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড নামের এই পুরস্কার প্রদানের জন্য রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)।

বৃহৎ শিল্প শ্রেণিতে বস্ত্র ও পোশাক উপ খাতে পুরস্কার পেয়েছে স্কয়ার ফ্যাশনস, জেনেসিস ফ্যাশনস ও উইজডম অ্যাটয়ার্স। এই শ্রেণির খাদ্য উপ খাতে ময়মনসিংহ অ্যাগ্রো, স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ও অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ; কেমিক্যাল উপ খাতে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, এসিআই গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট ও অলপ্লাস্ট বাংলাদেশ; ইস্পাত ও প্রকৌশল উপ খাতে এসআরএম, বিআরবি কেবলস ও ইফাদ অটোজ পুরস্কার পেয়েছে। বৃহৎ শিল্প শ্রেণিতে আরও পুরস্কার পেয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ ও ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ।

মাঝারি শিল্প শ্রেণিতে ডিভাইন আইটি, সাদ মুছা ফেব্রিক্স ও কিউএনএস কনটেইনার সার্ভিসেস পুরস্কার পেয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প শ্রেণিতে পুরস্কার পেয়েছে বঙ্গ বেকারস, সান বেসিক কেমিক্যালস ও মাসকে ওভারসিস। মাইক্রো শিল্প শ্রেণিতে স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস ও অন্যান্য কিন্ডারগার্টেন স্কুল পুরস্কার পেয়েছে। কুটিরশিল্প শ্রেণিতে গৃহ সুখন বুটিকস ও হামিম ল্যাসিক বিউটি পারলার এবং রাষ্ট্রীয় শিল্প শ্রেণিতে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার এবং খুলনা শিপইয়ার্ড পুরস্কার পেয়েছে।

এছাড়া প্রথমবারের মতো উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমে ভূমিকা রাখায় তিনটি ব্যবসায়িক সংগঠনকে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

দেশের দুয়ারে নতুন ক্রেতা

চীনা পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুল্ক আরোপ বাংলাদেশের কিছু কিছু খাতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। পাশাপাশি জুতা, প্লাস্টিক, সাইকেল, সিরামিকসহ বিভিন্ন খাতে নতুন ক্রেতা আসছেন।

উদাহরণ হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের মনিহারি পণ্যের চেইন স্টোর ডলার জেনারেল। এটি প্রাণ আরএফএল গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে প্লাস্টিক পণ্য কেনার জন্য। ডলার জেনারেলের বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ প্রায় ২ হাজার ৫৬০ কোটি, মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় দুই লাখ কোটি টাকার বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকা অগ্রাধিকার বা আমেরিকা ফার্স্ট নীতির অধীনে। ২০১৮ সালে চীনা পণ্যের উপর বাড়তি শুল্ক আরোপ করা শুরু করেন। এরপর কয়েক দফা নতুন নতুন পণ্যে শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুদ্ধ থেকে বাদ যায়নি ভারত, কানাডা, মেক্সিকো, ইউরোপীয় ইউনিয়নও।

সব মিলিয়ে আপাতভাবে মার্কিন-চীন বাণিজ্যযুদ্ধ বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ হয়েই সামনে আসছে। একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো বাজার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সেখানে ৬৮৮ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ যা আগের বছরের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি। এই রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্থাৎ ৮৯ শতাংশ আয়ে পোশাক থেকে। এরপরে রয়েছে জুতা, ১৪ কোটি ডলারের বেশি।

বাংলাদেশ থেকে প্রাণ আরএফএল নানা দেশে পণ্য রপ্তানি করছে। তাদের জুড়িতে বিস্কুট, চানাচুর, মসলাসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্লাস্টিক, বাইসাইকেলসহ অন্যান্য পণ্যও।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবার অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় স্কুল মিল নীতি ২০১৯-এর খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ১৯শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুরু হবে আর ২০২৩ সালের মধ্যে সারা দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার দেওয়া হবে। নীতিমালার খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে, একটি শিশুর প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় শক্তি চাহিদার ক্যালরির ন্যূনতম ৩০% স্কুল মিল থেকে আসা নিশ্চিত করা হবে। যা প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৩-১২ বছরের ছেলে ও মেয়ে শিশুদের জন্য এটি প্রযোজ্য হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সেল বা ইউনিট কাজ করবে।

সামরিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে ১৩ জন স্কুল পরিচালনা কমিটি চালাবেন। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৭৫ জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে, তবেই অনুমোদন পাবে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

চীন বাংলাদেশের বড়ো উন্নয়ন অংশীদার

রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন ২৬শে আগস্ট ২০১৯ চীনের বেইজিংয়ে চায়না স্টেট রেলওয়ে গ্রুপের চেয়ারম্যান Lu Dongf-এর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেন। এ সময় রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. সাইফুজ্জামান ও নাদিরা ইয়াসমিন জলি উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের উন্নয়নে চীন সরকারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়।

রেলপথ মন্ত্রী বলেন, উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে বাংলাদেশ রেল যোগাযোগ ক্ষেত্রে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে আগস্ট ২০১৯ ঢাকায় তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

চাঁদপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আইনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন

চাঁদপুর জেলায় একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আইনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ১৯শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। অন্যান্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলেই নির্মাণ করা হবে এবং চ্যান্সেলর থাকবেন রাষ্ট্রপতি।

প্রতিবন্ধীদের স্কুলের জন্য খসড়া নীতিমালায় অনুমোদন

প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালায় অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ। ১৯শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এই নীতিমালা চূড়ান্ত হলে মূলধারার স্কুলের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রতিবন্ধীদের জন্য স্কুল চালাতে হবে। যেখানে-সেখানে মানহীন স্কুল প্রতিষ্ঠা রোধ করার জন্যই এই নীতিমালা তৈরি করছে সরকার। প্রতিষ্ঠান বিষয়টি দেখবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং কারিকুলাম প্রণয়ন ও তা পরিচালনার বিষয়গুলো দেখবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি থাকবে। জেলায় ডিসির নেতৃত্বে ১৩ জন উপজেলায় ইউএনও'র নেতৃত্বে ১৩ জন এবং সেনানিবাস এলাকায় কর্নেল বা ব্রিগেডিয়ার পদের বর্তমানে চীন বাংলাদেশের বড়ো উন্নয়ন অংশীদার। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেল যোগাযোগ খাতে বিনিয়োগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বাংলাদেশের উন্নয়নে রেল সেবার উন্নয়ন, হাই স্পিড ট্রেন তৈরিসহ একাধিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের কাজ করার সুযোগ আছে বলে মন্ত্রী এ সময় উল্লেখ করেন এবং এজন্য চীনকে বাংলাদেশ রেলওয়ে খাতে আরো বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য কোরিয়ান ব্যবসায়ীদের প্রতি অর্থমন্ত্রীর আহ্বান

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, বাংলাদেশের জন্য বিদেশি বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত সুন্দর এবং অপার সম্ভাবনার দেশ। ২০শে আগস্ট ২০১৯ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে সেদেশের ১৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি একথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার একটি সম্ভাবনাময় দেশ। ব্যবসাক্ষেত্রে একটি বড়ো বাজার। দক্ষিণ কোরিয়াকে বাংলাদেশের ভালো ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে তিনি সেদেশের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কোরিয়ার বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশ সফর করে নতুন উদ্যোগ সন্ধানের জন্য অর্থমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানান।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০শে আগস্ট ২০১৯ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে সেদেশের ১৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন

বৈঠকে কোরিয়ান ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করে নতুন ব্যবসার সম্ভাবনা নিয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

নারীদের জন্য নতুন ক্রেডিট কার্ড চালু

সিটি ব্যাংক ও আমেরিকান এক্সপ্রেস (এমেক্স) যৌথভাবে নারীদের জন্য চালু করেছে দি সিটি আলো এমেক্স ক্রেডিট কার্ড। এটি ব্যাংকের প্রথম কন্ট্যাক্টলেস ক্রেডিট কার্ড। ৪ঠা আগস্ট গুলশানের শান্তা স্কাইমাকে সিটি আলো কার্যালয়ে এই কার্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়।

ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন শিল্পী ফরিদা পারভীন

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সিটি আলো এমেক্স ক্রেডিট কার্ডটি বাংলাদেশের নারীদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। লেনদেন সম্পন্ন করতে এটিকে পিওএস মেশিনে দিতে হবে না। শুধু মেশিনের পাশে নিলেই কার্ডটি পিওএস নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাবে। এ কার্ডটি চালু করলেই অনলাইনভিত্তিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান সেবা এক্সওয়াইজেডসহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় সুবিধা পাবে ব্যবহারকারী।

স্বর্ণপদক পেলেন ফরিদা পারভীন

এ বছর ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক পেয়েছেন কীর্তিমতী লালনগীতি শিল্পী ফরিদা পারভীন। ৪ঠা আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন মিলনায়তনে তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার চতুর্থবারের মতো আয়োজিত হয় ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ ও ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান।

কলকাতায় বাংলাদেশি মেয়ের সাফল্য

বাংলাদেশের শতাব্দী দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মাস্টার্স অব টেকনোলজিতে (এমটেক) সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে এবার প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছেন। একইসঙ্গে এই বিভাগে তিনিই প্রথম বিদেশি এবং বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও প্রথম এ সাফল্য এসেছে ৫ই আগস্ট *প্রথম আলো* পত্রিকায় এ তথ্য প্রকাশিত হয়।

শতাব্দী ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। এরপর ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি সুরাট, গুজরাট থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ব্যাচেলরস অব টেকনোলজিতে (বিটেক) ডিগ্রি অর্জন করেন।

অনুমতি ছাড়াই সৌদি নারীর বিদেশ ভ্রমণ

সৌদি আরবের নারীরা পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারবেন। ১লা আগস্ট বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সৌদি কর্তৃপক্ষ নারীদের একা বিশেষ ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানায়।

সংবাদপত্র ওফাজ ও অন্যান্য স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, নতুন নীতিমালায় ২১ বছর বয়সের বেশি নারীদের পাসপোর্ট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই তারা দেশত্যাগ করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া হবে আধুনিক সনদ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, দেশের জন্য যুদ্ধ করা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাল সার্টিফিকেট বা পরিচয়পত্র প্রদানের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এলক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে ডিজিটাল সনদ প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অচিরেই সারাদেশে একদিনে একযোগে এ সনদ প্রদান করা হবে।

২৯শে জুন একাদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে সরকারি দলের সংরক্ষিত সংসদ সদস্য হাবিবা রহমান খানের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী সংসদকে এ তথ্য জানান।

মন্ত্রী আরো বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাইজেশন তথ্যের ডাটাবেজ সংরক্ষিত আছে। ডাটাবেজ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত আছে। ডাটাবেজে মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় তালিকা, লাল মুক্তিবার্তা, সাময়িক সনদপত্র বিভিন্ন ধরনের গেজেটের ডিজিটাইজেশন করা তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। এ তালিকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রদর্শিত হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, গত ১০ বছরে বাদ পড়া মুক্তিযোদ্ধা ক্যাটাগরি অনুযায়ী অর্থাৎ বেসামরিক গেজেট, নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা), মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী, চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী মেডিক্যাল টিম, শব্দ সৈনিক, শহিদ এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ ৪ হাজার ১৮৮ মুক্তিযোদ্ধার নাম গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য ভবন ও স্কুল নির্মাণ করছে ডিএনসিসি

ঢাকায় বসবাসকারী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য গাবতলীতে চারটি ১৫তলা আবাসিক ভবন এবং একটি চারতলা স্কুল ভবন নির্মাণ করছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। ১৮ই সেপ্টেম্বর এ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডিএনসিসি মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম। মেয়র হিসেবে শপথ নেওয়ার পর পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের দুর্ভোগ লাঘবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া প্রথম নির্দেশ সঠিকভাবে বাস্তবায়নে মেয়র এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) অর্থায়নে গাবতলী সিটি পল্লিতে ডিএনসিসির ক্লিনারদের বসবাসের জন্য এ সকল ভবন নির্মাণ করছে।

অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, শপথবাক্য পাঠ করানোর পরপরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য একটি সুন্দর বাসস্থান গড়ার নির্দেশ দেন। তাই এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের জুনের মধ্যে ৭৮৪ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর জন্য আবাসনের ব্যবস্থা হবে। এছাড়া, মেয়র পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে জনগণকে সেবা প্রদানের জন্য পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

ডিএনসিসি মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য আবাসিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্তদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হবে

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্তদের উদ্দেশে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আপনারা আমাদের সত্যিকারের হিরো। আপনাদের জন্য আমরা গর্বিত। আপনারা নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবেন। আপনাদের উদ্ভাবন সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। পদকপ্রাপ্তদেরকে এগ্রিকালচারাল ইম্পর্ট্যান্ট পারসন (এআইপি) মর্যাদা দেওয়া হবে যা কৃষিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ। ২২শে আগস্ট রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে কৃষিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ৪৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনাবাদি জমিতে চিনাবাদাম চাষ

মেহেরপুরের চাষিরা লাভবান হচ্ছেন পতিত ও অনাবাদি বেলেমাটির জমিতে চিনাবাদাম চাষ করে। খরচ কম, ফলন ও বাজার দর ভালো এবং বেশি লাভ হওয়ায় দিন দিন এই এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাদামের চাষ। জেলার সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা, শ্যামপুর, টেংগারমাঠ ও গোপালপুর গ্রামের অধিকাংশ জমির মাটি বেলে। ফলে এই এলাকার চাষিরা ধান, গম, পাটসহ অন্যান্য ফসল আবাদ করে খুব একটা লাভবান হতে পারেন না। ধান কাটার পর এসব জমি সাধারণত পতিত থাকে। এজন্য ৯০ দিনের ফসল হিসেবে অল্প খরচে বাদাম চাষ করছেন এলাকার চাষিরা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, জেলায় এবার বাদাম

রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে ২২শে আগস্ট ২০১৯ কৃষিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রাপ্তদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক

চাষ হয়েছে ১৫ হেক্টর জমিতে। এক বিঘা জমিতে বাদাম চাষ করতে চাষিদের খরচ হয়েছে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা। সে ক্ষেত্রে বাদামের ফলন হয়েছে ৬ থেকে ৭ মণ আর এ ফলনে প্রায় ২০ হাজার টাকা ঘরে তুলছেন তারা। বাজারে প্রতিমণ বাদাম বিক্রি হচ্ছে ২৭শ থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত। এছাড়া বাদাম ছাড়ানো, শুকানোসহ যাবতীয় কাজ করে থাকেন এখানকার নারীরা। বাদামের গাছ আবার শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করছেন গৃহিণীরা।

আখের বাম্পার ফলন

রোগবালাই কম হওয়ায় ও সঠিক সময়ে সেচের পানি পাওয়ার কারণে আখের দ্বিগুণ ফলন হয়েছে সীতাকুণ্ডে। আশানুরূপ ফলন ও ন্যায্য দাম পাওয়ায় এবার আখ চাষে স্বাবলম্বী হয়েছে কৃষকরা। বাম্পার ফলনের কারণে বাজারের সর্বত্র আখের চাহিদা মতো সরবরাহ থাকায় সমান তালে আখ কিনছেন ক্রেতারা।

সূত্রমতে, এবার সীতাকুন্ডের পৌর এলাকা, বাড়বকুন্ড ইউনিয়ন, মুরাদপুর ইউনিয়ন ও বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রায় ১০ হেক্টর জমিতে অর্ধশতাধিক কৃষক আখের চাষ করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আখের চাষ হয়েছে বাড়বকুন্ডের হাতিলোটা গ্রামে। কৃষি কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীর কারিগরি সহযোগিতায় রোগবালাই দমনে সঠিক সময়ে কীটনাশক প্রয়োগসহ সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ফলন হয় আশানুরূপ। এতে ১০ হেক্টর জমিতে প্রায় ৬০ টন আখ উৎপাদিত হয়।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

জ্বালানি খাতে ৫শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ

জ্বালানিতে আসছে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। গঠন করা হয়েছে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিসিপিসিএল) রিনিউএবল। বাংলাদেশ এবং চীনের সরকার এই কোম্পানি দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫০০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ। ২৭শে আগস্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন এই কোম্পানী গঠনের সমঝোতা স্মারক (এমওইড) সই হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোম্পানি গঠনের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।

৫০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চারটি এলাকাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। জমির প্রাপ্যতা, সৌর রশ্মি, বায়ু প্রবাহ এবং গ্রিডের দূরত্ব বিবেচনায় পাবনা, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা এবং পায়রাকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পাবনা, সিরাজগঞ্জ এবং পায়রাতে তিনটি বড়ো কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

চীনকে সঙ্গী করে, নতুন এই উদ্যোগে বিদ্যুৎ বিভাগ আশার আলো দেখছে। সত্যিকার অর্থের নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গতি আসবে। নতুন কোম্পানিতে দেশীয় কোম্পানি নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (এনডব্লিউপিজিসিএল) এবং চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট কোম্পানির (সিএমসি) সমান অংশীদারিত্ব থাকছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার এবং চীন সরকার সমানভাবে এই কোম্পানির অংশীদার। পাবনা ৬০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ এবং পায়রা ৫০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ দিয়ে কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

আগামী ২ বছরের মধ্যে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন

বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্র জানায়, সরকার অনেক দিন থেকেই অকৃষি খাস জমিতে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করে আসছিল। এই প্রথম পাবনাতে ৬০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুতের জন্য ২০৫ একর অকৃষি খাস জমির সংস্থান করা সম্ভব হয়েছে। পাবনার সুজানগরের চররামকান্তপুর মৌজায় কেন্দ্রটির জন্য জমি দিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। এভাবে চরের অকৃষি জমিতে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলে দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

শ্রম কল্যাণ সম্মেলন ২০১৯

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সঠিক শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে পারলে নির্ধারিত সময়ের আগেই বাংলাদেশ দারিদ্র্যমুক্ত হবে। মন্ত্রী ২০শে আগস্ট ২০১৯ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে তিন দিনব্যাপী 'শ্রম কল্যাণ সম্মেলন ২০১৯'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মীদের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে। তিনি বলেন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব রৌনক জাহানের সভাপতিত্বে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, বায়রা'র সভাপতি বেনজির আহমেদ, আয়েশা ফেরদৌস, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ জুলহাস, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. সেলিম রেজা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ২৬টি দেশের ২৯টি মিশনের কাউন্সিলর (শ্রম) ও প্রথম সচিব (শ্রম) উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

সুন্দরবন ঘিরে কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা

সুন্দরবনকে ঘিরে কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষার (এসইএ) উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর মাধ্যমে চারপাশের শিল্প-কারখানা ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা তার বিশদ মূল্যায়ন করা হবে। একইসঙ্গে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাতটি বিশেষ সেক্টরের সমন্বিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাও (ইএমপি) প্রণয়ন করা হবে। এজন্য স্ট্রাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল এসেসমেন্ট (এসইএ) অব সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়ন অব বাংলাদেশ ফর কনসার্ভিং আউটস্ট্যান্ডিং ইউনিভার্সাল ভ্যালু অব দ্য সুন্দরবন, শীর্ষক সমীক্ষা প্রবণতা নিচ্ছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে সমীক্ষা শেষে বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করবে পরিবেশ অধিদপ্তর। সমীক্ষা প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকা।

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে সরকারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্মান দেয় ইউনেস্কো। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়তার জন্য দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাতটি খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বিবেচনা পূর্বক পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাঠামোও তৈরি হবে, যাতে সুন্দরবনের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি না হয়। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে– সুন্দরবন সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন, সুন্দরবনের ওপর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অন্যান্য প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিকল্প কৌশল প্রণয়ন, সরকারি ও বেসরকারি খাতের তদারকিতে পরিবেশগত কার্যক্ষমতা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের বিবেচনায় সাতটি খাত যেমন– পানিসম্পদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পর্যটন, নগরায়ণ, শিল্প পরিবহণ/যোগাযোগ ও নৌ চলাচলকে সম্পৃক্ত করা।

পরিবেশ মন্ত্রণালয় বলছে, সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এটি শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের আধারই নয় বরং দুর্যোগ থেকে এদেশের মানুষ ও সম্পদ রক্ষা করে এ বন। সুন্দরবনের তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আছে, যা মোট এলাকার ৫২ শতাংশ। সুন্দরবনের সংরক্ষিত এলাকার ১ লাখ ৩৯ হাজার হেক্টর ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং পুরো জলাভূমি রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃত। এ কারণে এ বনের গুরুত্ব দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও রয়েছে। এটি শুধু বাংলাদেশের সম্পদ নয়, বরং বিশ্ব ঐতিহ্যও অংশ এ বন। এ কারণে ইউনেস্কো এ বনটি সংরক্ষণে গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

সুন্দরবনের এবং ইসিএ (প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা) সীমার বাইরে শিল্পকারখানা স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কাজ উত্তরোত্তর বাড়বে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়সহ নানা কারণে সুন্দরবনসহ উপকূলীয় এলাকা সর্বাধিক ক্ষতির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুন্দরবনকে সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন, সুন্দরবনের ওপর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ এবং অন্যান্য প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিকল্প কৌশল প্রণয়ন, পরিবেশগত কার্যক্ষমতা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার উল্লেখযোগ্য খাতগুলোকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে টেকসই ব্যবস্থাপনা নেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

অপরাধ কমাতে মানিকগঞ্জ ও ঢাকা-পাটুরিয়া মহাসড়কে সিসি ক্যামেরা

সড়ক-মহাসড়কে অপরাধ কমাতে পুরো জেলা ও ঢাকা-পাটুরিয়া মহাসড়ক আনা হয়েছে সিসি ক্যামেরার আওতায়। মানিকগঞ্জ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে এ উদ্যোগ। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান, প্রশাসনিক এলাকা ও ঢাকা-পাটুরিয়া সড়কে স্থাপন করা হয়েছে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা। এতে করে দুর্নীতি, অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং অপরাধীদের দ্রুত সময়ের মধ্যে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা যাবে।

ঢাকা-পাটুরিয়া মহাসড়কের মানিকগঞ্জের সীমানায় সাটুরিয়া থানাধীন বারবারিয়া থেকে শিবালয় থানাধীন পাটুরিয়াঘাট পর্যন্ত মহাসড়কের ২০টি পয়েন্টে মোট ৫৬টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

গাজীপুরে চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু

গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা কেন্দ্রিক তাকওয়া চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু করেছে। ১লা আগস্ট নগরীর চান্দনা চৌরাস্তায় পরিবহণ শ্রমিক ভবনের সামনে ফিতা কেটে এ বাস সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. আনোয়ার হোসেন। এ সময় তিনি বলেন, স্বল্প দূরত্বে যাত্রীদের চলাচলের জন্য তেমন কোনো বাস নেই। এছাড়া মহানগরীর মহাসড়কে অটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এজন্য বিকল্প যান হিসেবে তাকওয়া পরিবহণের ৩০টি বাস তাকওয়া চক্রাকার বাস সার্ভিস যোগ করা হয়েছে। এসব বাস গাজীপুর মহানগরের নাওজোড় থেকে চান্দনা চৌরাস্তা হয়ে সালনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিববাড়ি থেকে চান্দনা চৌরাস্তা হয়ে ভোগড়া বাইপাস পর্যন্ত আবার চান্দনা চৌরাস্তা হয়ে নাওজোড় পর্যন্ত নিয়মিত চলাচল করবে। এ বাস সার্ভিসে অল্প ভাড়ায় যাত্রীরা স্বল্প দূরত্বে যাতায়াত করার সুবিধা পাবেন।

মহাসড়ক থেকে টোল আদায়ের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

দেশে সড়ক ও মহাসড়কের ওপর নির্মিত ব্রিজ ও সেতু থেকে টোল আদায়ের রীতি থাকলেও মহাসড়ক ব্যবহার করার জন্য টোল দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তবে এটি বাইরের অনেক দেশেই রয়েছে। বিদেশের মতো এবার দেশেও টোলের আওতায় আনা হচ্ছে জাতীয় মহাসড়ক। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় মহাসড়কগুলো টোলের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন। টোল থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা দিয়েই সারাবছর সড়কগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। ৩রা সেপ্টেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী ওই নির্দেশ দেন।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে আগস্ট ২০১৯ হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের তৃতীয় বোয়িং ড্রিমলাইনার 'গাঙচিল'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ড্রিমলাইনার গাঙচিল উদ্‌বোধন

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে নতুন যুক্ত হওয়া বোয়িং ৭৮.৭-৮ ড্রিমলাইনার গাঙচিল ২২শে আগস্ট আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঐদিনই হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এই বিমানটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়। ২৫শে জুলাই বিমানটি সিয়াটল থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। গাঙচিল যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে ড্রিমলাইনার বিমানের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩টিতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানটির নামকরণ করেছেন। বিমানটি প্রাথমিকভাবে ঢাকা-আবুধাবী রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করবে।

জানা গেছে, বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স ২০০৮ সালে মার্কিন বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং কোম্পানির সঙ্গে ১০টি নতুন বিমান কেনার জন্য ২১০ কোটি ইউএস ডলারের চুক্তি করে। সেই চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে বহরে যুক্ত হয়েছে ৬টি বিমান। বাকি চারটি বিমান হলো বোয়িং ৭৮.৭-৮ ড্রিমলাইনার। এর মধ্যে তিনটি বিমান বহরে যুক্ত হয়। বাকি একটি বিমান সেপ্টেম্বরে আসবে। বিমানের আসন সংখ্যা ২৭১টি। এর মধ্যে বিজনেস ক্লাস ২৪টি এবং ২৪৭টি ইকোনমিক ক্লাস। এটি ঘণ্টায় ৬৫০ মাইল বেগে উড়তে সক্ষম। বিমানটির ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক (জিই)। বিমানটি নিয়ন্ত্রিত হবে ইলেকট্রিক ফ্লাইট সিস্টেমে। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হওয়ায় এই বিমান ওজনে হালকা। ভূমি থেকে বিমানের উচ্চতা ৫৬ ফুট। দুটি পাখার আয়তন ১৯৭ ফুট। বিমানে যাত্রীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য রয়েছে ওয়াইফাই সুবিধা। এছাড়া, আকাশে উড্ডয়নের সময় ফোন কল করতে পারবেন যাত্রীরা।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বাড়ছে

পদ্মা সেতু প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বাড়ছে। ব্যয় বাড়ছে ১ হাজার কোটি টাকা আর মেয়াদ বাড়বে এক বা দু'বছরের মতো, পর্যালোচনা করছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। মূল সেতুর কাজে গতি ভালো। সেতু বিভাগের হিসাবে, জুন পর্যন্ত পদ্মা সেতুর কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৭১ শতাংশ। এর মধ্যে মূল সেতুর কাজ হয়েছে ৮১ শতাংশ। নদীশাসনের কাজ এগিয়েছে ৫৯ শতাংশ। মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এই অগ্রগতি গত সাড়ে চার বছরের। কাজ শেষ করার সময়সীমা এ বছরের ডিসেম্বর। মূল সেতু নির্মাণের কাজ করছে চীনের চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

হেপাটাইটিস বি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের স্বীকৃতি অর্জন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হেপাটাইটিস বি নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা অর্জনকারী প্রথম চারটি দেশের অন্যতম হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। ২৬শে জুলাই সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চারটি দেশ প্রথম পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে এই রোগের হার ১ শতাংশের নিচে আনতে সক্ষম হয়েছে। দেশ চারটি হলো– বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল ও থাইল্যান্ড।

ডব্লিউএইচও'র যাচাই ও পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, বিগত কয়েক বছর ধরে এসব দেশ ৯০ শতাংশ শিশুকে হেপাটাইটিস বি-এর টিকাদানের আওতায় এনেছে। আর শৈশবে হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ প্রতিরোধ বেশি বয়সের সংক্রমণ এবং লিভার ক্যানসার ও সিরোসিস প্রবণতা কমিয়ে আনে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক টিকাদান পরিকল্পনায় বিভিন্ন দেশে টিকাদানের মাধ্যমে ২০২০ সাল নাগাদ হেপাটাইটিস বি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্ড বিতরণ

নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রাজধানীর কোনাপাড়ায় মান্নান স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৩০০ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ৩রা আগস্ট হেলদি হার্ট হ্যাপি লাইফ অর্গানাইজেশন এ কার্ড বিতরণ করে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক এ আলোচনাসভায় জানানো হয়, পর্যায়ক্রমে দেশের পিছিয়ে পড়া অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্বাস্থ্যসেবা কার্ডের সুবিধার আওতায় আনা হবে। এছাড়া ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতার আহ্বান জানান তারা। আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সাংসদ হাবিবুর রহমান মোল্লা।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে মাদক তৈরি হয় না

বাংলাদেশে কোনো মাদক তৈরি হয় না, তবে এর আগ্রাসনে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। ঢাকার নবাবগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে কমিউনিটি পুলিশিং সেল নবাবগঞ্জ থানা ২৫শে আগস্ট সন্ধ্যা জঙ্গি ও মাদক বিরোধী সমাবেশের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, মাদকের ব্যাপারে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম মাদককে প্রশ্রয় দেয় না। আমরা কোনো মাদক তৈরি করি না, তবুও আমরা মাদকের আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। সমাজ থেকে সন্ত্রাস, জঙ্গি ও মাদক নির্মূল করে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে নতুন প্রজন্মের কাছে একটি শান্তিময় বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই।

দিনাজপুরে ডিজিটাল কিওস এলইডি ডিসপ্লে'র উদ্‌বোধন

মাদকের ভয়াবহতার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে দিনাজপুরে ডিজিটাল কিওস এলইডি ডিসপ্লে'র উদ্‌বোধন করা হয়। ২২শে আগস্ট জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দিনাজপুরের উদ্যোগে দিনাজপুর রেলওয়ে স্টেশন প্লাটফর্মে ডিজিটাল কিওস এলইডি ডিসপ্লে'র উদ্‌বোধন করেন দিনাজপুর জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল আলম। এই শহরে এ ধরনের আরো দুটি স্থানে ডিজিটাল কিওস এলইডি ডিসপ্লে করা হবে।

এসময় দিনাজপুর রেলওয়ে স্টেশন প্লাটফর্মে অবস্থানরত ট্রেন যাত্রীদের মাদক সম্পর্কিত সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করেন জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল আলম। তিনি বলেন, মাদক একটি ভয়াবহ ব্যাধি। এই ব্যাধিকে সমাজ ও দেশ থেকে চিরতরে নির্মূল করতে আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে।

মাদক অনুপ্রবেশে জিরো টলারেন্স

মাদক একটি ভয়াবহ ব্যাধি। পেশাদার মাদক কারবারিরা মিয়ানমার থেকে নতুন নতুন কৌশলে সড়ক ও নৌপথে মাদক পাচার করছে। সন্ত্রাস, মাদক, জঙ্গিবাদ ও অস্ত্রের বিরুদ্ধে যেমন জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তেমনি একইভাবে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশেও জিরো টলারেন্স থাকবে। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে ১৯শে আগস্ট চট্টগ্রাম আঞ্চলিক টাস্কফোর্স ও বিভাগীয় আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে বিভাগীয় সভায় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে মামলার পরিবর্তে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তির পরামর্শ দেন চট্টগ্রাম রেঞ্জ

ডিআইজি খন্দকার গোলাম ফারুক। তিনি বলেন, কারো কাছে পাঁচ থেকে দশ গ্রাম পরিমাণ ইয়াবা পাওয়া গেলে তাকে মামলা দিয়ে আদালতে না পাঠিয়ে মোবাইল কোর্টের আওতায় এনে সাজা দেওয়া গেলে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হবে।

প্রতিবেদন: জন্নাত হোসেন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শিল্পকলায় বঙ্গবন্ধুর লেখা ও বই প্রকাশনীর আয়োজন

বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও আদর্শ পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় এক ভিন্ন আয়োজন। শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় ২৫শে আগস্ট থেকে ৫ দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই প্রকাশনী ও বঙ্গবন্ধুর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সংস্কৃতি সচিব আবু হেনা মোস্তফা কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন। জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতার ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক কবি মিনার মনসুর।

সেলিম আল দীন জন্মোৎসব ও হিরোশিমা দিবস

আধুনিক বাংলা নাট্যরীতি বিনির্মাণের অন্যতম স্থপতি সেলিম আল দীনের ৭০তম জন্মবার্ষিকী ১৮ই আগস্ট ২০১৯। এ উপলক্ষে নাট্যসংগঠন 'স্বপ্নদলের' উদ্যোগে ৫ ও ৬ই আগস্ট বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারে দুইদিন ব্যাপী নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের জন্মোৎসব ২০১৯-এর আয়োজন করা হয়। ৫ই আগস্ট সেলিম আল দীনের জীবন-কর্ম-দর্শন নিয়ে আলোচনাসহ প্রধান অতিথি হিসেবে উৎসবের উদ্‌বোধন করেন নাট্যজন ম. হামিদ।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ৬ই আগস্ট 'আর নয় হিরোশিমা, আর নয় নাগাসাকি, আর নয় যুদ্ধ' শিরোনামে 'হিরোশিমা দিবস-২০১৯' পালন করে 'স্বপ্নদল'। এ উপলক্ষে নানা আনুষ্ঠানিকতা ও বাদল সরকারের মূল রচনা থেকে জাহিদ রিপন কর্তৃক রূপান্তর ও নির্দেশনাকৃত হিরোশিমা নাগাসাকিয় বিয়োগা যুদ্ধবিরোধী গবেষণাগার প্রযোজনায় 'ত্রিংশ শতাব্দী'-র ১০৮তম মঞ্চায়নের আয়োজন করা হয়। বিকেলে এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারের লবিতে হিরোশিমা-নাগাসাকিভিত্তিক যুদ্ধবিরোধী পোস্টার-আলোকচিত্র-চলচ্চিত্র ইন্সটলেশন আর্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। হিরোশিমা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. হিরোইয়াসু ইজুমি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নাট্যজন লাকী ইনাম। সবশেষে মঞ্চায়িত হয় স্বপ্নদল প্রযোজনায় 'ত্রিংশ শতাব্দী'।

সেলিম আল দীন স্মরণে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ই আগস্ট দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের ৭০তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। একটি শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে সেলিম আল দীনের সমাধিতে গিয়ে শেষ হয়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি দপ্তরে প্রতিবন্ধীদের তৈরি 'মুক্তা পানি' ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশনা জারি

এখন থেকে সব সরকারি দপ্তরে প্রতিবন্ধীদের তৈরি 'মুক্তা পানি' ব্যবহারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের শাখা-১ (প্রশাসন) থেকে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। ১৯শে আগস্ট ২০১৯ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সংশ্লিষ্ট সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের শাখা-১ (প্রশাসন) এর সহকারী সচিব মো. সামীম আহসান স্বাক্ষরিত এই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবেশিত ও বোতলজাতকৃত 'মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার' পরিবেশন/ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।'

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

সব প্রাইমারি স্কুলে দেওয়া হবে দুপুরের খাবার

শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষা ও পরিপূর্ণ পুষ্টি নিশ্চিত করতে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার সরবরাহের নীতি গ্রহণ করেছে সরকার। ১৯শে আগস্ট মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ নীতি উপস্থাপনের পর সেটি অনুমোদন পেয়েছে। আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে এই পদক্ষেপ পুরোপুরি বাস্তবায়ন হবে।

মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান। জাতীয় স্কুল

মিল নীতি ২০১৯-এর বিষয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় ১০৪টি উপজেলায় প্রাথমিকের শিশুরা দুপুরের খাবার পাচ্ছে। সমন্বিতভাবে তা সারাদেশে শুরু করার লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরো জানান, প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে এমন শিশুদের জন্য এই নীতিমালা। সে অনুযায়ী শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় শক্তি চাহিদার ক্যালরির ন্যূনতম ৩০ শতাংশ স্কুল মিল থেকে আসা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য তালিকার বৈচিত্র্য ঠিক রাখতে মোট ১০ পদের খাবারের আয়োজনের কথা বলা হয়েছে এ নীতিমালায়।

প্রথমবারের মতো খুদে শিক্ষার্থীদের অগ্নিনিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

দেশে প্রথমবারের মতো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে শিক্ষার্থীদের অগ্নিনিরাপত্তা প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। ১৫ই সেপ্টেম্বর পুরান ঢাকার বকশীবাজারের উমেশ দত্ত রোডের এ বিদ্যালয়টিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, অগ্নিঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে পুরান ঢাকা তথা চকবাজার এলাকার নাম উঠে আসে। এ এলাকায় প্রায়ই ছোটো-বড়ো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন থেকে বাঁচতে প্রাপ্তবয়স্কদের অনেককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এবার খুদে শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ আয়োজন করা হলো।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

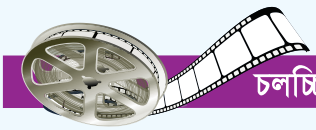

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

চার শিল্পীর পাশে প্রধানমন্ত্রী

অসুস্থ চার শিল্পীকে আর্থিক অনুদান দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৪ই সেপ্টেম্বর গণভবনে চার শিল্পীকে অনুদান প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী। অনুদান পাওয়া চার শিল্পীরা হলেন– সংগীত শিল্পী ডলি সায়ন্তনী, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত মেকাপ আর্টিস্ট কাজী হারুন, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত মেকাপ আর্টিস্ট আবদুর রহমান ও অভিনেতা মহিউদ্দিন বাহার। তাদের প্রত্যেককে ৫ লাখ টাকা করে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়। অনুদান প্রদানের সময় জোটের সাধারণ সম্পাদক জি এম সৈকত উপস্থিত ছিলেন। অনুদান দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে মমতাময়ী বলে সম্মান জানিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এ চার শিল্পী।

ঈদের সিনেমা

ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে যেসব সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল তারমধ্যে রয়েছে– শাকিব-বুবলী অভিনীত মনের মতো মানুষ পাইলাম না। এ ছবিটি পরিচালনা করেছেন নির্মাতা জাকির হোসেন রাজু। এ ছবির কাহিনি মূলত বর্তমান সমাজের নানা ধরনের দুর্নীতি প্রতিরোধে একদল যুবক-যুবতীর কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে। দেশ বাংলা মাল্টিমিডিয়ার প্রযোজনায় এ ছবিটির গানের দৃশ্যধারণ হয়েছে তুরস্কে। ছবিটি দেশের দেড় শতাধিক প্রেক্ষাগৃহে একাযোগে প্রদর্শিত হয়েছিল। এতে আরো অভিনয় করেছেন– সাবেরী আলম, সাদেক বাচ্চু, মিশা সওদাগর, ডন, বাসার মাসুম প্রমুখ। আবদুল্লাহ জহির বাবুর চিত্রনাট্যে এ ছবির গান লিখেছেন জাকির হোসেন রাজু ও গাজী মাজহারুল আনোয়ার। সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন শফিক তুহিন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ গণভবনে ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য ডলি সায়ন্তনীকে আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করেন–পিআইডি

রোশান ও ববি জুটি অভিনীত ছবি বেপরোয়া ছবিটিও ঈদে মুক্তি পায়। এটি প্রযোজনা করেছে জাজ মাল্টিমিডিয়া। প্রায় ৫৩টি হলে ছবিটি মুক্তি পায়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন কলকাতার রাজা চন্দ। এ ছবিটি থ্রিলার অ্যাকশন ঘরানার। ঈদের আরেক সিনেমা নবাগত শাকিল খান ও অর্পা অভিনীত ছবি ভালোবাসার জ্বালা। ছবিটির গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় আছেন বশির আহমেদ। সিনেমাটি সাপের গল্প নিয়ে নির্মিত। ছবিটিতে দেখা যাবে নাগকে মেরে ফেলেন নায়ক শাকিল খানের বাবা। প্রতিশোধ নিতে শাকিল খানের পুরো বংশ শেষ করে দেওয়ার অঙ্গীকার করে নাগিনী। প্রায় ১০টি প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তি পায়।

পরিচালক রাজু আলীম নির্মাণ করেন ভালোবাসার রাজকন্যা। এতে অভিনয় করেছেন– মৌসুমী হামিদ, শিপন মিত্র, অবিদ রেহান, ফারজানা চুমকি, কাজী রাজু, মিলি বাশার প্রমুখ। ছবিটি ৯ই আগস্ট দুটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। অরুণ চৌধুরী এ ছবিটির গল্প লেখেন। ঈদের দিন চ্যানেল আইতে ছবিটির বিশ্ব প্রিমিয়ার দেখানো হয়।

তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সনদপত্র বিতরণ

বাংলাদেশের তরুণ স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অংশগ্রহণে 'বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরাম' আয়োজিত তরুণ নির্মাতা চলচিত্র প্রদর্শনীতে ২৮টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ শাহবাগস্থ আজিজ সুপার মার্কেটের ৩য় তলার বাংলাদেশ চলচ্চিত্র কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মিলনমেলা'। উক্ত মিলনমেলায় তরুণ চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও নির্মাতা আপন চৌধুরীসহ ২৮ জনকে সনদপত্র ও সম্মানী দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্র ব্যক্তি নাসির উদ্দিন ইউসুফ, সভাপতি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক জাহিদুর রহিম অঞ্জন এবং সাধারণ সম্পাদক চলচ্চিত্র নির্মাতা রাকিবুল হাসান।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

শেখ হাসিনার আন্তরিকতায় পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতায় আজ পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শিক্ষা ও উন্নয়ন সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। ২৪শে আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সদর উপজেলার কদুখোলা ভাগ্যকুল হাইস্কুলের দ্বিতল ভবনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি এসব কথা বলেন।

পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি ২৪শে আগস্ট ২০১৯ কদুখোলা ভাগ্যকুল হাইস্কুলের দ্বিতল ভবন উদ্‌বোধন করেন

এসময় মন্ত্রী আরো বলেন, দুর্গম এই পার্বত্য জেলার প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখন আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছে এমনকি প্রতিটি বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময় মন্ত্রী বীর বাহাদুর ছাত্রছাত্রীদের সকল কাজ বাদ দিয়ে শুধু পড়ালেখায় বেশি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। মন্ত্রী শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা ছাত্রছাত্রীদের ভালো করে লেখাপড়া করান, বাসায় ভালো করে পড়ে আসবে এমন কথা না বলে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে বেশি করে পড়ালেখা করে শিক্ষিত করে তুলুন। তিনি এসময় প্রত্যেক শিক্ষককে তাদের দায়িত্বের প্রতি আরো সচেতন হওয়ার আহ্বানও জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কদুখোলা ভাগ্যকুল হাইস্কুলের দ্বিতল ভবনের উদ্‌বোধনের মধ্য দিয়ে দুর্গম এই বিদ্যালয়ের দুইশ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার ব্যাপক প্রসার ঘটবে এবং অনগ্রসর এই এলাকায় শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সোলার প্যানেল স্থাপনে ৭৬ কোটি টাকার প্রকল্প

তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে ৭৬ কোটি ৬ লাখ ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার। ২৭শে আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আয়োজিত সভায় এই তথ্য জানানো হয়। সংসদ ভবনে এই কমিটির সভাপতি মোঃ দবিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নামে একটি প্রকল্প ছাড়াও তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন, শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং, সচিবসহ মন্ত্রণালয় ও সংদস সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রান্তিক চাষিদের মাঝে ফলদ চারা বিতরণ

খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে মিশ্র ফলদ ও কলম চারা বিতরণ করা হয়েছে। ১৬ই আগস্ট মহালছড়ি উপজেলা টাউন হল মিলনায়তনে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের আয়োজনে ২৫০ জনের মাঝে মিশ্র ফলদ ও কলম চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহালছড়ি জোন অধিনায়ক লে. কর্নেল মেহেদী হাসান। ফলদ ও ঔষধি বাগান পাহাড়ের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে গেছে। খাগড়াছড়ির ফলের চাহিদা ও সুনাম এখন দেশজুড়ে। এ সুনাম ধরে রাখতে কৃষকদের আহ্বান করেন অনুষ্ঠানের বক্তারা।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

ভুটানকে হারিয়ে সাফে দুর্দান্ত শুরু বাংলাদেশের

সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলের শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে শুভ সূচনা করেছে বাংলাদেশ। ভুটানকে ৫-২ ব্যবধানে হারিয়েছে বর্তমান

ইয়াসির ঝলকে লঙ্কা বধে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের আনন্দ

শিরোপাধারীরা। ভারতের পশ্চিম বাংলার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ২৩শে আগস্ট অনুষ্ঠিত ম্যাচের শুরু থেকেই ভুটানের রক্ষণে হানা দিতে থাকে বাংলাদেশের কিশোররা। ফলও পেয়ে যায় হাতেনাতে। খেলার পঞ্চদশ মিনিটে দারুণ এক হেডে লক্ষ্যভেদ করেন বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড আল আমিন। পরে ভুটান সমতায় ফেরলেও ৮৩তম মিনিটে মিরাদের একটি গোলে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেয় বাংলাদেশ। এরপর যোগ করা সময়ে ফ্রি-কিক থেকে অসাধারণ এক গোল করে ভুটানের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন ইমন ইসলাম বাবু।

সাত গোলের ম্যাচে উত্তর কোরিয়ার দলকে হারাল আবাহনী

শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে আবাহনী লিমিটেড এগিয়ে যাওয়ার পর উত্তর কোরিয়ার দল এপ্রিল টোয়েন্টিফাইভ দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সাত গোলের রোমাঞ্চ ছড়ানো এএফসি কাপের নকআউট পর্বের ম্যাচটি জিতেছে আবাহনী। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ২১শে আগস্ট ইন্টার জোনাল প্লে-অফ সেমি-ফাইনালসের প্রথম পর্বে ৪-৩ গোলে জিতেছে আবাহনী।

ইয়াসির ঝলকে লঙ্কা বধ করল বাংলাদেশের উদীয়মানরা

জিততে হলে শেষ দুই ওভারে চাই ২০ রান। ২ ছক্কা হাকিয়ে কঠিন এই সমীকরণ সহজ করে দিলেন ইয়াসির আরাফাত। তবে দলের জয়ের মূল নায়ক অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও ইয়াসির আলী। এই দুই তরুণের ব্যাটিং ঝলকেই শ্রীলঙ্কার ইমার্জিং দলকে ২ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে ১-১ সমতা ফিরিয়েছে বাংলাদেশের তরুণরা। বিকেএসপিতে প্রথম ম্যাচে লঙ্কান পেসারদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছিল বাংলাদেশ ইমার্জিং দল। হারের পর উদীয়মান তারকাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন মাশরাফি-মুশফিকরা। আর সেই কথা বলাই হয়তো তাতিয়ে দিয়েছে। ২১শে আগস্ট দ্বিতীয় ম্যাচেই তাই সেই ধাক্কা সামাল দিয়ে দারুণ জয় তুলে নিলেন শান্ত-ইয়াসিররা। তাইতো লঙ্কানদের ছুড়ে দেওয়া ২৭৪ রানের লক্ষ্যও ৩ বল হাতে রেখেই পেরিয়ে এল ২ উইকেটের জয়।

নতুন করে ফিল্ডিং শিখছে টাইগাররা

বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বে প্রতিযোগিতার হার বাড়ছে ক্রমান্বয়ে। সবাই চায় নিজেকে ছাড়িয়ে অনন্য এক উচ্চতায় পৌঁছাতে। ম্যাচ জিততে নিজেকে উজাড় করে দিতে চায় সবাই। আর একটা ম্যাচ জিততে হলে ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং তিন বিভাগেই ভালো করতে হয়। তবে পরিস্থিতির বিচারে অনেক সময় শুধু মাত্র ফিল্ডিং দিয়েও কখনো কখনো ম্যাচ চিত্র পালটে দেওয়া যায়।

এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ফিল্ডিং ছিল সবচয়ে খারাপ। যার ফলে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয় টাইগাররা। ফিল্ডিংটা ভালো হলে হয়তো বিশ্বকাপের ফলাফলটা অন্যরকমও হতে পারত।

বিদেশের মাটিতেও উন্নতি চায় বিসিবি

দেশের মাটিতে বরাবরই অন্যতম এক পরাশক্তির নাম বাংলাদেশ। তবে দেশের বাইরে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স মোটেও সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশের নতুন কোচ রাসেল ডমিঙ্গোর ভাবনায় এবার তাই বিদেশের মাটিতে উন্নতি। ডমিঙ্গোর এই চিন্তা-ভাবনার সাথে পুরোপুরি একমত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ২৪শে আগস্ট তাই টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সাকিব আল হাসান, প্রধান কোচ রাসেল ডমিঙ্গো এবং দুই নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু ও হাবিবুল বাশারকে নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন বিসিবি'র ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান।

প্রতিবেদনঃ মো. মামুন হোসেন

না ফেরার দেশে চলচ্চিত্র অভিনেতা বাবর

আফরোজা রুমা

চলচ্চিত্র অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক খলিলুর রহমান বাবর না ফেরার দেশে চলে গেলেন। ২৬শে আগস্ট সকাল ৯টা ১০ মিনিটে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই ডায়াবেটিস, রক্তচাপ ও ফুসফুসের জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে তিনি গ্যাংরিনের সমস্যায় ভুগছিলেন। গত ৯ই জুন অপারেশন করে তাঁর বাঁ পা অপসারণ করা হয়েছিল। বাবরের বাঁ পায়ের তিনটি আঙুল গ্যাংরিনে আক্রান্ত ছিল। তিনি নিরাপদ সড়ক চাইয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিনি মূলত খল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন।

খলিলুর রহমান বাবর ১৯৫২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি ঢাকার গেন্ডারিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। আমজাদ হোসেনের হাত ধরে স্বাধীনতার ওপর চলচ্চিত্র নির্মিত 'বাংলার মুখ' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাবরের 'আত্মপ্রকাশ'। খল অভিনেতা হিসেবে বাবরের যাত্রা শুরু হয় রাজ্জাক প্রযোজিত ও জহিরুল হক পরিচালিত 'রংবাজ' চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে। ১৯৭৩ সালে মুক্তি পায় তাঁর আরো দুটি ছবি মহিউদ্দিন পরিচালিত 'দুরন্ত দুর্বার' ও কবির আনোয়ার পরিচালিত 'স্লোগান'। তাঁর অভিনীত ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায় রুহুল আমিনের 'বেইমান'। ১৯৭৫ সালে মুক্তি পায় রহিম নেওয়াজ পরিচালিত 'আপনজন' ছবিটি। ১৯৭৬ সালে তিনি অভিনয় করেন আলমগীর কুমকুমের জনপ্রিয় ছবি 'গুন্ডা'-তে। ১৯৭৬ সালে মুক্তি পায় তাঁর আরো একটি বাণিজ্যসফল ছবি 'প্রতিনিধি'। নন্দিত পরিচালক দিলীপ বিশ্বাসের ১৯৭৮ সালে ছবি 'আসামী'-তে তিনি অভিনয় করেন। ১৯৭৮ সালে তাঁর অভিনীত দিলীপ বিশ্বাসের আরেকটি ছবি 'দাবি' মুক্তি পায়। ১৯৭৮ সালে তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছবি মুক্তি পায় 'সারেংবউ'। এ ছবিটিতে তিনি অসামান্য অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মন জয় করেন। এ ছবির পরিচালক ছিলেন আব্দুল্লাহ আল মামুন। ১৯৮০ সালে তিনি বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন। যেমন– নজরুল হুদা মিন্টুর 'সংঘর্ষ', শেখ নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'নাগিন'। বাবরের অভিনীত ১৯৮০ সালে আরো একটি ছবি মুক্তি পায় 'শেষ উত্তর'। ১৯৮১ সালে তিনি একাধিক ছবিতে অভিনয় করেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবি হলো– 'জনতা এক্সপ্রেস' ও মহানগর এবং দিলীপ বিশ্বাসের বাণিজ্যসফল ছবি 'অংশীদার'। ১৯৮৩ সালে মুক্তি পায় পরিচালক শামসুদ্দিন টগরের ছবি 'বানজারান'। ১৯৮৪ সালে তাঁর মুক্তি পায় দারাশিকো পরিচালিত ছবি 'জিপসি সরদার'। ১৯৮৬ সালে ৬টি ছবিতে অভিনয় করেন। ছবিগুলো হলো– 'আয়নামতি', 'নাগমহল', 'বিচারপতি', 'মালাবদল' ও 'দাগী'। 'দাগী' তাঁর প্রথম একক প্রযোজিত ছবি। ১৯৯৫ সালে তিনি নির্মাণ করেন 'দয়াবান' ছবিটি। ২০০০ সাল থেকে অনেক টিভি নাটকে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত নাটক– 'বর পক্ষ বনাম কনে পক্ষ' বাচসাস পুরস্কার পায়। মনোয়ার হোসেন ডিপজলের 'তের পান্ডা এক গুন্ডা' চলচ্চিত্রে সর্বশেষ অভিনয় করেছিলেন বাবর। তিনি পরিচালনা করে 'দয়াবান' ও 'দাদাভাই'-সহ বেশ কিছু জনপ্রিয় ছবি ভক্তদের উপহার দেন। তাঁর পরিচালিত ছবিগুলো সাধারণের মনে জায়গা করে নেয়। তবে পরিচালকের ভূমিকার চেয়ে অভিনয়েই ছিল তাঁর বেশ মনোনিবেশ। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন বাবর।

বাবরের প্রথম জানাজা বাদ জোহর শুক্রাবাদ জামে মসজিদ এবং বাদ আসর এফডিসিতে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আমরা এই গুণী শিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করছি।